ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বারিদবরণ ঘোষ

নিউ এজ পাবলিশার্স

দিল্লি • কলকাতা • পুনা • এরনাকুলাম

সূচিপত্র

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ

যে-মনীষীর আবির্ভাবে উনিশ শতকে একটি বিশিষ্ট যুগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, রামমোহন রায় সেই যুগন্ধর মহাপুরুষ। যুগ সৃষ্টির ইতিহাসে এমন আবির্ভাবকে মাঝে মাঝে লক্ষ করা গেছে। রামমোহনের আবির্ভাবকালে তৎকালীন হিন্দুসমাজ নবাগত মিশনারিদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রায় শেষ ভাগে রামমোহন কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি সাহিত্য-ধর্ম-রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব বস্তুতই উনিশ শতককে দুটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। অষ্টাদশ শতক বাহিত নানান পুরোনো বিচিত্র সংস্কারের আবর্তে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছিল। রক্ষণশীলতা সমাজের মধ্যে কালাপাহাড়ি শক্তিতে চেপে বসেছিল। আবার সেই চাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শ্বাসগ্রহণের একটা ইচ্ছাকেও সমাজের একাংশ মনে মনে পোষণ করছিল। এবং তার একটা সুযোগও ভারতের তৎকালীন রাজনীতিগত প্রয়োজনে এসে গিয়েছিল। এই কালের মধ্যে দেশে ইংরেজ শাসন বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দেশশাসনের জন্য কর্মচারীর প্রয়োজন। অথচ সুদূর ইংল্যান্ড থেকে সমগ্র কর্মচারী নিয়ে এসে রাজ্যশাসন বিদেশি শাসকের পক্ষে সর্বাংশে সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই অন্তত করণিক শ্রেণির

কর্মচারী প্রস্তুতের একটা তাগিদ ইংরেজ সরকার অনুভব করছিল। এবং তা করতে হলে 'নেটিভ'দের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হলো। মনে রাখতে হবে, এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের অহৈতুকী হিতৈষণা সক্রিয় ছিল না। বরং ধর্মগত কারণে মিশনারিরা এবং রাজনৈতিক কারণে শাসকগোষ্ঠী এ-দেশীয়দের শিক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু 'উল্টাইয়া বসিল কফ মজ্জার সহিতে'। ফল হলো বিপরীত। ইংরেজি শিক্ষা এ-দেশে আরম্ভ হয়ে গেলে বিদেশাগত স্বাধীন আবহাওয়ার স্বাদ এ-দেশীয় মুক্তিকামীগণ অনুভব করতে থাকলেন এবং এই প্রতিক্রিয়াতেই তাঁরা বিদেশি ইতিহাসের অনুকরণে পুরোনো সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের দীক্ষায় দীক্ষিত হলেন।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এই সুযোগ মুক্তিকামীদের কাছে আশীর্বাদের মতো এসে উপস্থিত হলো। স্যার হাইড ইস্ট এবং ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ার প্রমুখের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বছরেই কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলো। এবং নিরাপদে বলা চলে যে, এ-বছর থেকেই যথার্থ 'আধুনিকতা'র সূত্রপাত ঘটল।

সুতরাং একদিকে রামমোহনের কলকাতায় বসবাসে এবং অপরদিকে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ায় বাংলার ধর্ম, শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। যুগের সুপ্ত কামনা এই আন্দোলনের মন্থনে অমৃতময় রূপলাভে সমর্থ হলো।

২

এই সময়ে বাংলাদেশে বেদান্তচর্চা ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। রামমোহন কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই অনুবাদ ও ভাষ্যসহ 'বেদান্ত

গ্রন্থ' প্রকাশ করলেন।[১]

বেদান্তচর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি ইতিমধ্যে অনুভব করেছিলেন। এ ছাড়া ব্রহ্ম সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য রামমোহন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মীয়-সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। এই 'আত্মীয় সভা'তেই আসলে ব্রাহ্মসমাজের বীজ উপ্ত হয়েছিল। ২২. ৫. ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ সন) সংখ্যায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা এই সভার অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছে—

"— ৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতী স্ত্রীর স্বামী মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ করার কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিচার হইল সেই সময়ে বেদ উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ী বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"[২]

এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী

---

১. প্রকাশকাল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।

আখ্যাপত্র : The Bengali Translation of Vedant, or Resolution of all the Vedas; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the supreme being, and that he is the only object of worship. Together with a preface. By the Translator. Calcutta : from the Press of Ferris and Co. 1815.

২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০০।

বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদকে প্রচলন করা।[১] এ-ধরনের ধর্মপ্রচার স্বাভাবিক কারণেই সমাজে তৎকাল প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল। কেন রামমোহন এই প্রকারের ধর্মবিচার ও প্রচারের অবাঞ্ছিত সংগ্রামকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন, এ-প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ-সম্পর্কে রামমোহন নিজেই বলেছেন—

"My constant reflection on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my country-men, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error, and by making them acquainted with devotion to the unity and omnipresence of Nature's God.

By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahmin, have exposed myself to the complainings and reproaches even of my relations whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends on the present system."

কলকাতায় আসার পূর্বে রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, তখন থেকেই

---

১. "At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet etc. was freely discussed and generally admitted— the atrocity of an infant widow passing her life in a state of celibacy— the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned." আত্মীয় সভার এই ৯.৫.১৮১৯ তারিখের অধিবেশনেই 'Superstitious ceremonies in use amongst idolators'-কেও তিরস্কার করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য— Calcutta Journal, 18.5.1819, বিনয় ঘোষ প্রণীত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ. ৮৩।

হিন্দুসমাজের কতকগুলি সংস্কারকে তিনি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ভাবতে থাকেন। বাঙালির চিত্ত তখনও পশ্চিমাগত আলোকে উদ্‌বোধিত হয়নি বটে, তবুও রামমোহন যে-মানবিকতার যুগ আসছে তাকে বরণ করার জন্য, আধুনিক কালের নূতন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং বাস্তব-জীবনপ্রীতি তথা স্বাজাত্যবোধে সমাজকে উদ্দীপিত করার মানসে সমাজসংস্কারে মন দিলেন। সে-দিক থেকে 'আত্মীয় সভা' সমাজসংস্কারের একটি কেন্দ্র ছিল। রামমোহন কার্যতই লক্ষ করেছিলেন, হিন্দুসমাজে যে-ধর্মাচরণ চলেছে, তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ নেই। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কুসংস্কার ও বাহ্যিক আচার, ধর্মের পক্ষে 'has become fashionable'। তা ছাড়া কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি সম্পর্কিত অনাচার ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করে এবং উপনিষদাদি ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করে তাঁর স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, পৌত্তলিকতা একটা অযৌক্তিক আচার মাত্র।

খ্রিস্টীয় ধর্মের উপর নবানুভূত চিন্তাধারাকে প্রসারিত করার জন্য রামমোহন উইলিয়ম অ্যাডাম নামক এক শিষ্য-বান্ধবের সাহায্য নিলেন। বলা বাহুল্য, রামমোহনের এই পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

আশ্বিন ১৭৬৯ শকে প্রকাশিত ৫০তম সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'[১] সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করেছিলেন। সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, 'পরমশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ব্রহ্মোপাসনা' যখন এ-দেশে একেবারে বিস্মৃত হয়েছিল তখন রামমোহন রায়

১. 'আত্মীয় সভা' প্রথমে মানিকতলার উদ্যানে, পরে ষষ্ঠীতলার বাড়িতে, তৃতীয় বারে রামমোহনের শিমুলিয়াস্থিত বাসভবনে এবং পুনর্বার মানিকতলার উদ্যানে স্থানান্তরিত হয়।

নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এ-কথাই বুঝেছিলেন যে, 'সর্বকারণ পরব্রহ্মের উপাসনাই সত্যধর্ম এবং কেবল তাহাই পরম পুরুষার্থের একমাত্র কারণ।' এই উপলব্ধি প্রকাশের জন্য তিনি রংপুর থেকে কলকাতা এসে 'বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনারূপ সত্যধর্ম স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।' কিন্তু সমর্থনের হাত যে সকলেই প্রসারিত করলেন তা নয়। সে-কালের বিখ্যাত ব্যক্তিরা রামমোহনকে শ্রদ্ধা করলেও দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গোপীনাথ মুন্সী প্রভৃতি অঙ্গুলিপর্বগণ্য ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যেরা অপৌত্তলিক রামমোহনের সংসর্গ ত্যাগ করলেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী আরও লিখেছেন, "সায়াহ্নকালে আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং মদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরমধর্মকে অবলম্বন করিলেন।"

ব্রাহ্মসমাজ কোনোকালেই কণ্টকমুক্ত সমাজ ছিল না, আত্মীয় সভার কালেও নয়। সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিরূপতা ব্যতীত ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধিতা তাঁকে নিরন্তর ব্যস্ত ও বিব্রত রাখত। ফলে 'আত্মীয় সভা পর্যন্ত আর হইত না।' ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে বিহারীলাল চৌবের তুলাবাজারস্থ বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যখন মন্তব্য করেন যে 'বঙ্গদেশে বেদপাঠ নাই ও ব্রাহ্মণও নাই', তখন সভাস্থ অন্য সকল ব্রাহ্মণেরা নিরুত্তর থাকলেও রামমোহন তাঁর অপরিমেয় মেধাবলে শাস্ত্রীকে 'নিরস্ত' করলেন। তবুও বিরোধিতার নিরসন হয়নি এবং একসময়ে আত্মীয়

সভারও বিলুপ্তি ঘটল। কিন্তু রাজার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ভাঙন ধরেনি; তিনি সন্ধ্যাকালে নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা করতেন।

৩

আস্তিক রামমোহনের চিত্ত ধর্মালোচনার জন্য ব্যাকুল হতো বলে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে খ্রিস্টীয় চার্চসমূহে যেতেন। একদিন চার্চের উপাসনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রামমোহনের দুই একেশ্বরবাদী বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করলেন যে, আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য কেবল মিশনারিদের দ্বারস্থ না হয়ে নিজেদেরই একটা ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এই মহৎ প্রস্তাবেই সাধারণ[১] ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্র হইল। রামমোহন রায় এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রামমোহন সমাজের একটি গৃহনির্মাণের জন্য জমির সন্ধান করতে লাগলেন। শিমুলিয়াতে একখণ্ড জমি ঠিক করেও সম্ভবত ধর্মগত কারণে সেটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল।

তখন ধর্মকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনার আদর্শকে রূপায়ণের জন্য এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাতকল্পে ১৭৫০ শকের ৬ ভাদ্র (১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে জোড়াসাঁকোর রামকমল বসুর (ফিরিঙ্গি রামকমল নামে পরিচিত) বাড়ির একাংশ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। 'তৎকালে প্রতি শনিবার

১. শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রচেষ্টায় স্থাপিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নয়।

সায়ংকালে সমাজ হইত, তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলাঙ্গ ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য সম্পন্ন হইত।'[১] তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই নবস্থাপিত সমাজের কার্যনির্বাহক ছিলেন।

অচিরকালের মধ্যে এই সমাজ স্থাপনে রামমোহনের সাফল্য পরীক্ষিত হয়ে গেল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের কাছ থেকে আপার চিৎপুর রোডের সন্নিকটে একটি স্থায়ী পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করা গেল। ইতিমধ্যে সমাজের কিছু অর্থাগমও হয়েছিল। কাজেই একটা ট্রাস্ট-ডিড সম্পাদন করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। ৮ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের একটি Trust deed সম্পাদিত হলো এবং ১১ মাঘ ১৭৫১ শকে (জানুয়ারি ১৮৩০) সমাজের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হলো। ব্রাহ্মসমাজ নূতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাচার দর্পণে সে-সংবাদ প্রকাশিত হয়:

"চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।— গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কয়এক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্মাণ করাইতেছেন। ত্রষ্ট-ডিড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ত্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারী লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন। ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সহরদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক, ৫০তম সংখ্যা, সম্পাদকীয় রচনা।

ও নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণীহিংসা হইতে পারিবে না। অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে একজন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।"[১]

এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উল্লিখিত সংখ্যায় অধিকন্তু যে-সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তাও কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়— 'এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসান কালে মোসল্‌মান ও ফিরিঙ্গি বালকেরা পারসীক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত, তৎকালে মেকিন্টস কোম্পানি সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।' হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের একাসনে বসে উপাসনার এমন অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রতিবছর ভাদ্র মাসে সমাজের আবির্ভাব তিথিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান বিতরণ করা হতো; উদ্দেশ্য— ব্রাহ্মসমাজকে জনসমক্ষে পরিচিত ও উন্নীত করা। এই অর্থ দিতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরামোহন মল্লিক প্রমুখ বিত্তবানেরা। তত্ত্ববোধিনী সাবধানে মন্তব্য করেছেন, 'কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজ হইতে অতি সংগোপনে দান প্রতিগ্রহ করিতেন।' কথিত আছে মূল্য দানে সর্বশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সংগুপ্ত দান গ্রহণজনিত

১. সমাচার দর্পণ, ১৬ জানুয়ারি ১৮৩০ (৪ মাঘ ১২৩৬) সংখ্যা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২০।

পাপ অর্থমূল্যে শুদ্ধ করে নিয়ে প্রকাশ্যে রামমোহনের বিরোধিতায় কোনোদিন নিরুৎসাহ বোধ করেননি। প্রত্যুপকার মহান ধর্ম। ব্রাহ্মণদের প্রত্যুপকারে রামমোহনের জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত দেখা দিল। রামমোহন সশস্ত্র হয়েই বাড়ি থেকে বের হতেন।

এ তো গেল ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের আক্রমণ। রক্ষণশীল সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রামমোহনের সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। রবিবার ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ (৫ই মাঘ) তারিখে সংস্কৃত কলেজে এক ধর্মসভা আহূত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধর্মসভার কার্যনির্বাহক নির্বাচিত হলেন। যাঁরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছেন বা বিপরীত কর্মে লিপ্ত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্করহিতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।[১]

'সমাচার দর্পণ' লিখল— 'আমাদিগের দেশে ধর্ম্মশাসন কর্ত্তৃত্বাভাবে ধর্মহানি হইতেছে অতএব সধর্ম্ম এবং সদাচার সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপিত হয়, সেই ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগর মধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।'[২]

কিন্তু বিরোধিতা ব্রাহ্মসমাজের শ্বাসরোধ করতে পারেনি।

যাই হোক, নবস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম 'বিশিষ্ট মনোনীত' ব্যক্তি বা আচার্যের নাম রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সে-সময়ে তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। ইনি এই বয়সের মধ্যেই রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন এবং রাজার শিক্ষক শিবপ্রসাদ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। উত্তরকালে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের

১. দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০৪।
২. সমাচার দর্পণ, ৬. ২. ১৮৩০ : ২৪ মাঘ ১২৩৬।

প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রচিত অথবা স্বরচিত উপনিষদব্যাখ্যান পাঠ করতেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজার বিলাত গমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাখ্যানের সংখ্যা ছিল ৯৮।[১] (এঁরই জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার— সন্ন্যাসাশ্রমে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে পরিচিত— রামমোহনের গুরু ছিলেন।)

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবদ্দশায় ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপাচার্যের কাজ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পর শ্রীধর বিদ্যারত্ন ও তাঁর পর শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ উপাচার্য নিযুক্ত হন। ইহার পর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আচার্যপদে বৃত হন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত মিলিত হইয়া আচার্যের কার্য নির্বাহ করিতেন।[২] এঁদের প্রসঙ্গ আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আলোচিত হবে।

নবনির্মিত গৃহে যে-উপাসনা হতো তার পদ্ধতি ছিল এই প্রকার: প্রথমে একজন ব্রাহ্মণ পার্শ্বস্থ একটি পর্দাবিযুক্ত কক্ষ থেকে বেদপাঠ করে সংলগ্ন অপর বিস্তৃত কক্ষে উপস্থিত মিশ্রজাতির শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনাতেন। কারণ সে-কালে ব্রাহ্মণেতর কোনো জাতির বেদপাঠ করা বা বেদপাঠ শোনার সাক্ষাৎ অধিকার ছিল না বলে কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই এঁদের সামনে বেদপাঠে সম্মত হতেন না। এর পর বেদ ও বেদান্তের বাংলা ব্যাখ্যান করে শোনানো হতো। এবং সবশেষে রামমোহন ও তাঁর শিষ্যবর্গ (যথা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ)

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন ১৮৩৭ শক সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
২. কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত।

রচিত একেশ্বরবাদসম্মত বাংলা ভক্তিগীতি সংগীতজ্ঞেরা পাখোয়াজ সহযোগে গাইতেন। এখানে একটি লক্ষ করার ব্যাপার যে, উদার মতাবলম্বী রামমোহনের ওই সমাজে পাখোয়াজ ও তবলা বাজাতেন মুসলমান সংগীতবিদ ও অনেক সময় গান করতেন ইউরেশীয় খ্রিস্টান ও মুসলমান বালকগণ। রামমোহন খ্রিস্টান ও মুসলমান ছেলেদের শিক্ষা দিতেন।[১]

এই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর আধুনিক ভারতের জন্ম ও প্রগতির ইতিহাস পরোক্ষভাবে একই— রামমোহন এই আধুনিক ভারতের 'জনক'।

৪

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন ইংল্যান্ডে যান। এই সময়ে সমাজের প্রথম কার্যনির্বাহক তারাচাঁদ চক্রবর্তী মহাশয়ও অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে এলেন বিশ্বম্ভর দাস। ১৭৫১ শকের পৌষ মাসে রমানাথ ঠাকুর এবং রাধাপ্রসাদ রায় (রাজার পুত্র) 'সমাজগৃহের বিশ্বস্ত হইলেন'। রামমোহনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবশ্য এঁরা সমাজবিধির অন্য কোনো পরিবর্তন করলেন না, শুধুমাত্র শনিবারের পরিবর্তে বুধবারে উপাসনার দিন স্থির করলেন। রামমোহনের অনুপস্থিতিকালে অর্থানুকূল্য করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এ-সময়ে সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মেকিন্টস কোম্পানি। সে-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের ব্যাবসার পতন ঘটার আগেই দ্বারকানাথ এঁদের কাছ থেকে

১. Jogananda Das, The Brahmo Samaj, Studies in the Bengal Renaissance (Ed. Atul Gupta).

দু-হাজার আশি টাকা বুঝে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এর থেকে যে-সুদ হতো, তার অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহও তিনি করতেন। সে-সময় রাধাপ্রসাদ রায় সমাজের নির্বাহকের কাজও করতেন।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংল্যান্ড বাসকালে রামমোহনের মৃত্যু হয় ব্রিস্টল নগরে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহীগণের মধ্যে নিরুৎসাহ বহন করে আনল। কারণ রামমোহনের ব্যক্তিত্বের তাঁরা পূজারি মাত্র ছিলেন, তাঁর কর্মোদ্যম ও সামর্থ্যের অংশীদার ছিলেন না। তা ছাড়া রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় 'পিতৃপ্রাপ্য ধন'-এর ব্যবস্থা করার জন্য দিল্লি রওনা হন। ফলে 'ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা' দেখা গেল। এই ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দেই ধন বিতরণ প্রথা রহিত হলো।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দশ বছর (১৮৩০-৩৯) ধরে সমাজের অবস্থা খুবই 'ম্লান' ছিল। তৎকালীন আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই দশ বছর ধরে রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস বলে বলীয়ান হয়ে কোনো প্রকারে সমাজের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রদীপে অপরিমিত তৈল সংযোগ করে ব্রাহ্মধর্মের এই ক্রমঅপম্রিয়মাণ আন্দোলনকে পুনর্জ্যোতির্ময় করে তোলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উদ্যোগের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে এটুকুই।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ

প্রথমপর্ব ১৮৩৯-১৮৫৭

ভারতের ধর্মজাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহনের ব্রহ্মচিন্তা যে-গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, তা আপাতদৃষ্টিতে মন্দীভূত হয়ে এসেছিল মনে হলেও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং বলা যেতে পারে সেই আপাতস্থিতিশীলকালে তা স্থিরগতি সঞ্চার করে (potential energy) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পূর্ণবেগে ধাবিত হতে পেরেছিল।

রামমোহন জানতেন যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিসহ পৌত্তলিকতা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে বড়ো রকমের বাধাস্বরূপ। নাস্তিক্যবাদ এর সমাধান নয়। সে-কথাও তিনি অনুভব করেছিলেন। কাজেই ডিরোজিয়ানদের তিনি সযত্নে পরিহার করে বিশ্বধর্মের (অর্থাৎ তাঁর ব্রাহ্মধর্মের) মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মূল ধর্মশাস্ত্রগুলিকে সযত্নে অনুধাবন করে রামমোহন প্রাচ্যের গুরুবাদ ও পৌত্তলিকতায় এবং পাশ্চাত্যের ত্রীশ্বরবাদের (Trinity) মধ্যে একটি মাত্র সত্যকেই কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকতে লক্ষ করলেন, এবং তা হলো— একমাত্র পরব্রহ্মই হলেন 'Author and Preserver of the Universe'। ধর্ম আসলে একম্, অনুষ্ঠানই বিচিত্র। শুধু বিচিত্র নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্মদাতা। এই অনুষ্ঠানের আশ্রয় কতকগুলো দেবমূর্তি, গুরুবাদ অথবা প্রতীক। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে অঙ্গীকার করে। ফলে মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে এবং ধর্মে-ধর্মে অনিবার্য পার্থক্য সৃষ্টি করে।

সুতরাং পৃথিবীতে একটিমাত্র জাতি তথা একম্ মনুষ্যত্বের আবির্ভাবকে সম্ভব করার জন্য বিশ্বাত্মা রামমোহন নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ও প্রচারে উদ্যোগী হলেন।

২

রামমোহনের এই ধারণা বাইশ বছরের যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) চিত্তকে সর্বাংশে প্রভাবিত করেছিল। একটা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এমনিতেই বর্তমান ছিল। সে-কারণে ধর্মালোচনার জন্য তিনি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'[১] নামক একটি ধর্মকেন্দ্রিক সভা স্থাপন করলেন।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কোনো যোগাযোগ ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়নির্বাহ করতেন বলেই সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নামটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এমনই দীন অবস্থায় পতিত হয়েছিল। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র জন্ম হয়। উপনিষদ-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করার জন্যই এ-সভার প্রতিষ্ঠা। এবং ওই সভার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই ব্রাহ্মসমাজ অবসন্নাবস্থা থেকে প্রাণবন্তাবস্থায় উজ্জীবিত হয়। শুধু তা-ই নয়, উনিশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' ('Young Bengal') গোষ্ঠীর বিদেশি সংস্কৃতিসর্বস্ব চিন্তা, স্বদেশোৎখাতের সংকল্প এবং স্বদেশ-সংস্কৃতির কেন্দ্রভ্রষ্ট ক্রিয়াকলাপে দিবাস্বপ্নের রূপায়ণের যে-ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল, প্রাচীনের প্রতি যে-অবজ্ঞা

১. প্রথমে এই সভা 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নামে আখ্যাত হয়।

ও অশ্রদ্ধা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল, সেই বন্যার অনিবার্য বেগকে স্তিমিত করে চিত্তকে স্বদেশাভিমুখী করার একটি স্থিত প্রয়াস ও 'সামাজিক-ঐতিহাসিক আবশ্যকতা'[১] উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে প্রবল হয়ে উঠেছিল। স্বাদেশিকতার সেই কামনার পথ বেয়েই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র আবির্ভাব ঘটে।

দেশের লোক যখন ব্রাহ্মসমাজের নাম প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল, সে-সময় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র খ্যাতি বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্জাগরণ সম্ভব হলো। রামমোহনের 'ঈশোপনিষদ'-এর একটি ছেঁড়া পাতা একদিন দেবেন্দ্রনাথের কাছে উড়ে এলো। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁকে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' মন্ত্রের অর্থ জানালেন। দেবেন্দ্রনাথ যেন অমৃতকে আস্বাদন করলেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে ঈশ্বরের সম্পর্কে যে-চিন্তার উদয় হলো তা তিনি 'আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন।'[২] এই নিয়ে একদিন অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠদের ডাকলেন। 'সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয় তৎপরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতা হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মালোচনার জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবে পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯) এই সভা জন্মগ্রহণ করে।'

এই তত্ত্ববোধিনী সভা রামমোহনের ধর্মপ্রচারের জন্য তিনটি উপায় নির্ধারণ করল—

এক. একটি পাঠশালা স্থাপন। এই পাঠশালায় উপনিষদ পাঠের উপর জোর দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে

---

১. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯-১৪।

২. রাজনারায়ণ বসু, ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৭২ শক, ২১১ সংখ্যা।

বাঁশবেড়িয়ায় একটি পাঠশালা 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। চার বছর পর অর্থাভাবে স্কুলটি উঠে যায়।[১]

দুই. বেদাধ্যয়নের জন্য চার ব্যক্তিকে কাশী প্রেরণ। এই সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য ও রমানাথ ভট্টাচার্যকে কাশী পাঠানো হয়।

তিন. ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ।

দ্বিতীয় উপায়টি থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেবেন্দ্রনাথ এ-সময়ে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। এটা কোনো ছিন্নমূল ব্যাপার নয়। পথিকৃৎ রামমোহন শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শাস্ত্র-সাহায্যে বিচারাদি করতেন। আসলে antiquity-র প্রতি শ্রদ্ধা নবযুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল। রামমোহনের মতানুসারে দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করতে লাগলেন। 'যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল, আমার চেতনা হইল। আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।'[২] এবং তাঁর সত্যধর্ম প্রচারের ইচ্ছা জন্মাল। 'আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার'[৩] তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩, ১ ভাদ্র, ১৬ আগস্ট প্রথম প্রকাশ) শিরোনাম ছিল, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটি। পরে দেবেন্দ্রনাথের

---

১. যে-খ্রিস্টানধর্ম রহিতের জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়টি উঠে গেলে সেখানেই পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এমনই অবস্থার পরিহাস।

২. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— আত্মজীবনী (তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৬২), পৃ. ১৮।

৩. তদেব, পৃ. ২৬।

উপলব্ধির পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বাণী ও মন্ত্র মুদ্রিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনটি সবিশেষ লক্ষণীয়। কারণ এর মধ্য দিয়ে 'ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যয়-সন্ধানী সংগ্রামের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশে, এবং বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় কোন পত্রিকা নেই যা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রসঙ্গে এই দাবী করতে পারে।'[১] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তার ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কারণ বিচারেও অগ্রসর হয়েছিল।

৩

১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ দিনটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এই ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা তিনটের সময় দেবেন্দ্রনাথ সমেত ২১-জন সভ্য রীতিমতো প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠপূর্বক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন। সর্বপ্রথম দীক্ষা নিলেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, পরে দেবেন্দ্রনাথ। পরে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র রায়, লোকনাথ রায়, উমেশচন্দ্র রায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ও রাধাপ্রসাদ রায় দীক্ষিত হলেন। দীক্ষা দিলেন আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

---

১. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬।

৭ পৌষ দিনটির কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এটি একটি উদ্‌বোধনের মাহেন্দ্রমুহূর্ত। শুধু তা-ই নয়, ব্রাহ্মধর্মকে উদ্দেশ্য করে একটি রীতিমতো মিলিত 'সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলো। রামমোহনের 'সমাজে' উপাসনা হতো, এবং কয়েকটি ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত হতেন। কিন্তু এখান থেকে একটি 'ধর্মসমাজ'-এর আবির্ভাব ঘটল। সে-কারণেই দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের এ একটি নতুন ব্যাপার'।[১]

'অপৌরুষেয়' বেদ ও বেদান্তের উপর ভিত্তি করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এক 'অপৌত্তলিক হিন্দু জাতীয়তা' ভিত্তিক চরিত্র দান করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্মের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম' ছিল না, ছিল 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের গোষ্ঠী প্রতিজ্ঞাপূর্বক যে ধর্মগ্রহণ করলেন তার ফলে সমাজে মহাতরঙ্গের আবির্ভাব ঘটল এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিজ্ঞাপত্র সংশোধিত হয়ে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'র পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি ব্যবহৃত হলো। কারণ ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মগ্রন্থের নামকরণ হলো 'ব্রাহ্মধর্ম'। গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, ঈশ্বরকৃপায় আবিষ্টাবস্থায় তিনি তাঁর উপনিষদের কথা বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রতিলিখনের মতো লিপিবদ্ধ করে নিলেন। "এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষদ সত্যের আবির্ভাব হইতে লাঁগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম। . . . তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল।"[২]

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৪৬।

২. তদেব, পৃ. ১৩৩-৬৪। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

রামমোহনের সভায় যাঁরা থাকতেন, তাঁদের সকলকে ব্রাহ্মপন্থী মাত্র মনে করা হতো। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের দীক্ষা, পূর্বেই বলেছি, নিঃসন্দেহেই এ-ব্রাহ্মসমাজকে একটি system-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার, নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিধিনিষেধের শাসন প্রবর্তন করে সমাজকে কৌতূহলের বস্তু থেকে একটি দৃঢ়রূপ দান করল। সমাজাভ্যন্তরে এর পর থেকে কতকগুলি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল, তা বিচার করলে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে।

রামমোহনের সমাজে শূদ্রের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করতেন না; আসলে সে-সময়ে কোনো ব্রাহ্মণই শূদ্রসমক্ষে বেদপাঠে রাজি হতেন না। রামমোহন এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি নিজে বা তাঁর পার্ষদরা বেদপাঠ করতেন না। এই বাধা প্রথমে দেবেন্দ্রনাথই অপসারিত করলেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এটি একটি বড়ো পদক্ষেপ। জীবনের বড়ো বৈশিষ্ট্যই তো তার নিত্যপরিবর্তনশীলতা ও বিকাশমুখীনতা। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী'র সাংবৎসরিক সভায় অনেক অব্রাহ্মণের সম্মুখেই 'দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন।' অবশ্য এ-কথাও স্মরণীয় যে রামমোহনের ট্রাস্ট-ডিডে একথার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, 'সকল জাতিই নির্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে।'

দীক্ষাগ্রহণ এবং শূদ্রসমক্ষে বেদপাঠের মতো দুটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা ব্যতীত আমরা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়ও উল্লেখ করছি। কারণ এই বিশ্বাসগুলিই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মদর্শনের রূপদান করেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রাদির অভ্রান্ততায় প্রথমজীবনে আস্থাশীল ছিলেন। 'বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা

প্রচার করা আমার. . . মুখ্য সংকল্প ছিল।' অর্থাৎ তিনি বেদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী'র বিখ্যাত সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তর প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাস হারালেন। একদিনেই এই ব্যাপার ঘটে যায়নি। নানা যুক্তিতর্ক এবং আলোচনার পর দেবেন্দ্রনাথের মতপরিবর্তন ঘটেছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার অব্যবহিত পর থেকেই প্রচলিত শাস্ত্রাদির নির্দেশ মান্য করার ব্যাপারে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথকে। প্রধানত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেদবিশ্বাস প্রচার করেছিলেন। অপরপক্ষে এজুরাজ রামগোপাল ঘোষ, প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ী ও যুক্তিবিদ অক্ষয়কুমার দত্তর প্ররোচনায় তাঁর চার শিষ্যকে বেদাধ্যয়নের জন্য কাশী পাঠালেও শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসমুক্তি ঘটল। 'বিনা রক্তপাতে একটি মহান্ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল।'[১]

বেদের দেবতাসমূহের মধ্যে অগ্নির প্রাধান্য সর্বাধিক। হস্তপদহীন এই দেবতাদের পূজাও পৌত্তলিকতার নামান্তর— এ-কথা মনে হলে দেবেন্দ্রনাথ বেদের উপর আস্থা হারালেন এবং তিনি লিখেছেন, 'এখন আমরা বেদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী গৃহস্থ হইলাম।'[২] অর্থাৎ বেদ ত্যাগ করলেন, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমী রইলেন।

এবারে তিনি উপনিষদে আস্থা স্থাপন করলেন কিন্তু যখনই আলোচনা করে দেখলেন, উপনিষদ একাদশখানি মাত্র নয়, তা বহু সংখ্যক (১৪৭ প্রকার) তখন উপনিষদেও সান্ত্বনা পেলেন না— 'কি দুর্ভাগ্য সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না'।[৩]

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৯ শক, ৮৮৬ সংখ্যা।

২. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৯৮।

৩. তদেব, পৃ. ১২৩।

শেষ পর্যন্ত জীবনের এক বাঞ্ছিত মুহূর্তে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘটল। তিনি বললেন, 'আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েই ব্রাহ্মধর্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি।'[১]

ব্রাহ্মধর্ম এই আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্রুতগতিতে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র রচনা করে প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ— এসব কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রামমোহন বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার একস্থানে বলেছেন— পরমেশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন, এই দুই হলো পরম মুখ্য উপাসনা। এর মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের বীজ প্রত্যক্ষ করলেন।

বীজচতুষ্টয়:[২]

এক. ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যাৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্বমসৃজৎ।— পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

দুই. তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি-সর্বনিয়ন্তৃ-সর্বাশ্রয়-সর্ববিৎ-সর্বশক্তিমৎ ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি।— তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

তিন. একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।—

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ১২৯।

২. বঙ্গানুবাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোভূষণ হিসাবে এই মন্ত্রচতুষ্টয় প্রকাশিত হতে থাকে।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

চার. তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।— তাঁহাকে প্রীত করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বগুলি রূপলাভ করেছিল। এই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কয়েকটি অন্যবিধ ঘটনা ঘটায় ব্রাহ্মধর্মান্দোলন আরও গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই সালেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে গতিতে আরও বেগ যোগ করেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে, রামমোহনের মৃত্যুর ন-বছর পরে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন; ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাস থেকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের সংখ্যা পাঁচ শততে দাঁড়ায়।

৪

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নানা যুগোপযোগী কারণের মধ্যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার বন্ধ করা। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল যাতে বঙ্গসমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়ে যায়। উমেশচন্দ্র সরকার নামক এক কিশোর নাবালক অবস্থায় সস্ত্রীক খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে। উমেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর বয়স তখন ছিল যথাক্রমে চৌদ্দ ও এগারো বছর। সুপ্রিম কোর্ট অভিভাবকের পক্ষে রায় দিলেন না। এতে আইনগত আতঙ্ক ব্যতীত সাধারণের মনে এই ভয় দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত অন্তঃপুরের নারীরাও খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করতে চলেছে। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত

উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ডাফ সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি দুর্গম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন। অক্ষয়কুমার দত্তকে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে প্রতিবাদলেখনী চালাতে বললেন (দ্রষ্টব্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'— জ্যৈষ্ঠ ১৮৪৫ খ্রি.) এবং স্বয়ং হিন্দুনেতা রাধাকান্ত দেব ও 'ইয়ং বেঙ্গল' নেতা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারান্দোলন আরও গতিবান হলো। পাদরিদের অবৈতনিক শিক্ষা বর্জনের জন্য ২৫. ৫. ১৮৪৫ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদনক্রমে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং একদিনেই চল্লিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। প্রধান শিক্ষক কৃতবিদ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সভাপতি রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। মাসে হাজার টাকা ব্যয়নির্বাহের জন্য বরাদ্দ হলো। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই অবধি খ্রিস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'[১] কাজেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য এই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হলো। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ঘটনাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে বর্ধমান রাজবাড়ি মধ্যে মহারাজা মহাতাবচাঁদ একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ বর্ধমান ভ্রমণে যান এবং তারপরই সেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তৎপুত্র আফতাবচাঁদের সময়েও ওই সমাজ বর্তমান ছিল। শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও তারকনাথ তর্করত্ন দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক উক্ত সমাজের উপাচার্যরূপে নিযুক্ত হন।

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৬৫।

কৃষ্ণনগররাজ শ্রীশচন্দ্রও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রচারক হাজারীলালকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করলে 'শূদ্র' হাজারীলালের প্রতি শ্রীশচন্দ্র বিরক্ত হন। পরে দেবেন্দ্রনাথ একজন 'ব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মকে উপাচার্য হিসাবে পাঠালে সেই সমাজ মহারাজের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়। ফলে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মবিরোধী দল খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। অনুমান করি, শ্রীশচন্দ্র মনেপ্রাণে ব্রাহ্মধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি। অবশ্য বর্ধমানরাজের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথকে তিনি প্রকাশ্যে বরণ না করলেও তাঁকে 'অন্তরে' গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত নিম্নশ্রেণিদের মধ্যে প্রসারলাভ করেনি। প্রধানত নব্য অভিজাতশ্রেণির ধর্মরূপে ব্রাহ্মধর্ম আবির্ভূত হয়েছিল। অবশ্য এও লক্ষণীয় যে সামন্তপ্রথার সঙ্গে এই আভিজাত্যের যথেষ্ট পরিমাণে পার্থক্য ছিল। বলা যেতে পারে, বাহ্যাচারসর্বস্ব হিন্দু জাতিকে বুদ্ধির আলোকে উদ্দীপ্ত করা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের ও বিশ্বজনীন মানবধর্ম প্রচারের যে-আদর্শ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ বাহ্যাচার, পৌত্তলিকতা, প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তার সঙ্গে ইউরোপের Protestantism-এর অনেক পরিমাণে চরিত্রগত ঐক্য ছিল।[১] অবশ্য এও স্বীকার্য যে উভয়ের সামাজিক পরিবেশ ভিন্নতর। কেননা ধর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্য ছিল। এই আদর্শ পোষণের মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ রেনেসাঁসের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার বার পরিবর্তনের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ

১. তুলনীয়, "From the point of social history Protestantism may be defined as the religious phase of modern Western civilization"—Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 12, pp 71-75 : Protestanism by H. Richard Niebuhr.

করেছি। এটা আসলে সময়ের মূল্যের প্রতি মর্যাদা দান। সমাজের উপাসনার দিন শনিবার থেকে বুধবারে পরিবর্তিত হয়। কারণ কেউ কেউ শনিবার আসতে 'অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন'।[১]

উপাসনাগৃহটিকেও যথোচিত মর্যাদা দান করা হলো। পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত উপাসনাকক্ষটির সঙ্গে খ্রিস্টীয় চার্চের একটা আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এটি অনুকরণমাত্র বলে লঘু করে দেখা উচিত নয়, বরং বলা যেতে পারে যে অভিজাত সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্মকে বরণ করে নিয়েছিলেন এটি সেই অভিজাত রুচির প্রকাশমাত্র।

কাজেই উদ্দেশ্য, প্রচার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সময়ের মর্যাদা, আভিজাত্য সবকিছু মিলিয়ে দেখলে এ-কথা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মসমাজ একটি আধুনিক যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।

এই ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এই কালের মধ্যে কীভাবে এগিয়ে চলেছিল তা আমরা নিম্নলিখিত তথ্যাদি থেকে আহরণ করতে পারি:

১. ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৫০০-জন প্রতিজ্ঞাগ্রহণপূর্বক ব্রাহ্ম হলেন।

২. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ হয়ে গেল; এবং

৩. ১৮৪২-৫৯-র (তত্ত্ববোধিনী সভার সমাপ্তিকাল) মধ্যে বঙ্গদেশে মোট (আদি কেন্দ্র ব্যতিরেকে) তেরোটি সমাজ[২] স্থাপিত হয়েছিল, ১৮৬০-৬৯-র মধ্যে বাংলাদেশে যার সংখ্যা বেড়ে আরও পঁচিশটি

---

১. মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের অন্তরঙ্গ অনুকারীদের সংখ্যা কম ছিল। সুতরাং শনিবারে স্ফূর্তির দিনটা বৃথা যেতে দিতে অনেকের আপত্তির কারণ ছিল।

২. কাশীপুর, বেহালা, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, কুমারখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বর্ধমান, ফরিদপুর, বলুহাটি, বগুড়া ও রাজশাহী— এই তেরোটি সমাজ।

> হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও ২২টি সমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করে।[১] সারা ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় এর গতিবেগ যে খুব বেশি ছিল, এমন বলা সংগত হবে না। কারণ ব্রাহ্মসমাজের আবেদন তৎকাল পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ-সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'In this act of propagation, the *Tattwabodhini Patrika* rendered great help. There having been no regularly appointed mission aries of the Samaj at that time, the *Patrika* largely fulfilled the want. In the course of a few years samajes sprang up in many stations outside Calcutta through the influence of the Paper. Some amongst the educated men, who were its readers, imbibed the new principles, took counsel together and established samajes in their own localities.'[২]

এই কালের মধ্যে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও রামতনু লাহিড়ীর উপবীত ত্যাগ।

রাজনারায়ণ বসু ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'যেদিন প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিভেদ আমরা মানি না— উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন

---

১. বিহারে ৪টি, আসামে ১টি, উড়িষ্যায় ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৫টি, মধ্য ভারতে ২টি, পশ্চিম ভাবতে ২টি, সিন্ধুপ্রদেশে ২টি ও দক্ষিণ ভারতে তিনটি— মোট ২২টি সমাজ।

২. Shivanath Shastri, History of the Brahmo Samaj, Vol. 11, p. 310.

রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।'[১]

এরপর তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে একযোগে কাজ শুরু করেন। উপনিষদাদি ইংরেজিতে তর্জমার ব্যাপারে রাজনারায়ণ সহায়তা করতেন (যদিও বেতন গ্রহণ করতেন)।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে গ্যারিটির বাগানে যে-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে রাখালদাস হালদার উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব করে বলেন, 'ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়।' এবং তিনি নিজে উপবীত ত্যাগ করেন।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্মের উপবীত রাখা অসংগত ভেবে উপবীত ত্যাগ করেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে ও বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে যথেষ্ট আলোড়ন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই ঘটনায় যথেষ্ট আলোড়িত হন। এবং পরিশেষে উপবীত ত্যাগকে বিধেয় বলে অনুভব করেন। রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত এই মতের বিরোধিতা করেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, স্বয়ং রাজা রামমোহন আমৃত্যু উপবীত রক্ষা করেছিলেন।

এইভাবে আমরা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় এসে পড়লাম।

---

১. রাজনাবায়ণ বসু, আত্মচরিত (২য় সংস্করণ, ১৯৬১), পৃ. ২৮ ২৯।

মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র

১৮৫৭-১৮৬৬

ব্রাহ্মসমাজ ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে কতখানি সফল হয়েছে সে-বিচারে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যুগের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দান বলে মর্যাদা দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে আত্মমর্যাদার আবির্ভাব ঘটে। আর যথার্থ আত্মমর্যাদাজ্ঞান অপরের স্বাতন্ত্র্যকেও শ্রদ্ধা করে। চিত্তের প্রসারের পক্ষে এই বোধ অবশ্য কাম্য। রামমোহনের আত্মমর্যাদাবোধ ও বিশ্বাত্মায় আস্থা প্রবাদস্থলীয়। দেবেন্দ্রনাথের মর্যাদাজ্ঞানও অনুকরণযোগ্য। কিন্তু রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ অন্তত একটি ক্ষেত্রে পৃথক ছিলেন। রামমোহন যতখানি সংস্কারক, দেবেন্দ্রনাথ সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক। আবার অধ্যাত্মসংস্কার ক্ষেত্রে রাজা বা মহর্ষি কেউই খুব উগ্রপন্থী ছিলেন না; বিরোধিতা করলেও তাঁরা পারতপক্ষে সাধারণের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি সাক্ষাৎভাবে। অর্থাৎ সমাজ যতখানি নমনীয় তার উপরে অধিকতর চাপ দানে তাঁরা গররাজি ছিলেন।

২

কিন্তু যুবচিত্ত স্বভাবতই ভাবপ্রবণ ও বিদ্রোহী। কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই ভাবপ্রবণতা বিদ্যমান ছিল। উনিশ শতকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত যুবচিত্তের একটি প্রবণতাই এই ছিল যে, যা-কিছু পুরোনো সংস্কার, রীতিনীতি, আচার— তার বিরোধিতা করাই যথার্থ সংস্কার। বিশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র— যিনি

অনতিকালমধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন— তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যোগ দিলেন। এই সংযোগ প্রথমে পত্রমাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং পরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, দুটি যুগচিত্ত এক মহান অধ্যাত্মসূত্রে বাঁধা পড়ল। বাংলা[১] এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় কেশবচন্দ্রের অধিকার ছিল তর্কাতীত। ফলে ব্রাহ্মসমাজের বাণী প্রচারে (বঙ্গদেশে ও বহির্বাংলায়) তা যথেষ্ট সহায়ক হলো। কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবে 'প্রচার সংস্থা' হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তার ফলেই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই সভা রহিত হয়।

কেশবচন্দ্র ছিলেন স্থিতধী, ধার্মিক, শক্তি ও তেজসম্পন্ন যুবাপুরুষ। আত্মশক্তিবলে তিনি ডিরোজিওর মতোই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লেন অচিরেই। কেশবচন্দ্রের সময়ে পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়ে একদল যুবক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে এবং মদ্যপান ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খলতাকে সভ্যতার পরিচায়ক বলে মনে করে।[২] নীতিভ্রষ্ট এই যুবকেরা ক্রমে হিন্দুসমাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে কেশবচন্দ্র প্রমাদ গুনলেন। দেশের ভাগ্য যে যুবকেরাই গড়ে, এ-কথা কেশবচন্দ্র জানতেন। সেজন্য তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এই ছিন্নমূল প্রবণতার দিক পরিবর্তন করতে চাইলেন। তিনি লিখলেন— 'Young Bengal this is for you' এবং পরে 'An Appeal to Young India.'[৩]

১. বিপিনচন্দ্র পাল স্বীকার করেছেন যে কেশবচন্দ্রের বাংলা বক্তৃতা শুনে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্রষ্টব্য— 'প্রবাসী', সত্তর বৎসর, পৌষ ১৩০৪, পৃ. ৪২০।

২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ২৬।

৩. প্রকাশকাল ১৮৬৫।

ঈশ্বরবিহীন শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা করা কেশবচন্দ্র পবিত্র কর্তব্য বলে ভাবলেন। কারণ তাঁর মতে নাস্তিকের শিক্ষা সকল বিনষ্টির মূল। কেশবচন্দ্র লিখেছেন, 'Not only has it shed its baneful influence upon the individual but it has proved an effective engine in constructing the social advancement of the people and rendering more fightful the intellectual, domestic and moral distinction of the millions of our countrymen.'[১] তিনি আরও ঘোষণা করলেন, 'To the influence of ungodly education is to be attributed the want of progress in the social condition of the country'।[২]

পুস্তিকাটি যুবচিত্তের একাংশকে জাগ্রত করল। কেননা ইতিমধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিল।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বিদ্যালয় এবং ওই বছরের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে স্থাপিত অধ্যক্ষ সভার কার্যে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ সহায়করূপে পেলেন। উভয়ের চেষ্টায় একদল কর্মীগোষ্ঠীও তৈরি হয়ে গেল। এদের মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ বসু, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু উল্লেখযোগ্য। পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য), গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা), আনন্দমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখেরা। সমাজ কর্মমুখর হয়ে উঠল। প্রধানত কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় স্থাপিত হলো— ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'সঙ্গত সভা' এবং ১৮৬৩তে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'। দ্বিতীয় সভাটির প্রধান কাজ ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রদান।

---

১. এবং ২.— উক্তি দুটি প্রাগুক্ত 'Studies in the Bengal Renaissaince' গ্রন্থভুক্ত 'Brahmananda Keshub Chandra Sen' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

শুধুমাত্র শিক্ষাবিস্তার নয়, সেবাকার্যে উভয়ে এগিয়ে এলেন। এই সেবাপরায়ণতা আসলে ঈশ্বরপ্রীতিসঞ্জাত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে, ১৮৬১-৬২তে ভাগীরথীর উভয় তীরে ম্যালেরিয়া মহামারীর আক্রমণে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যুকালে সেবার কার্যে স্বয়ং কেশবচন্দ্র এগিয়ে আসেন।

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ ২৩ জানুয়ারি ১৮৬২ তারিখে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

কেশবচন্দ্র অন্তরে এক অমিত গতিবেগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ব্রাহ্মসমাজে প্রভূত শক্তি দান করেছিল। রেভারেন্ড লালবিহারী দে কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষ ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র যে-বক্তৃতা দেন তাতে ইউরোপীয় পাদরিরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান। এমনকী ব্রাহ্মবিরোধী পাদরি ডাফ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'The Brahmo Samaj is a power of no mean order in the midst of us',[১] সামাজিক বন্ধনবেদনা থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা এই স্বাধীনতাবোধের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছিল। দেবেন্দ্রনাথও এই স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রসমক্ষে বেদপাঠের রীতি প্রবর্তনায় সে-বিষয় আমরা লক্ষ করেছি।

৩

কিন্তু কেশবচন্দ্র স্বাধীনতা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো আপোসের পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস তিনটি কারণে সংকুচিত

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নবম খণ্ড, কেশবচন্দ্র, পৃ. ৩৪।

ছিল— এক. ধর্মসাধনের একমুখীনতা ; দুই. ধর্মমতের একদেশদর্শিতা এবং তিন. একতন্ত্রতা। এবং প্রধানত এই তিনটি কারণ উপলক্ষ্য করেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির বিরোধ বাধল। ব্যাপারটা একান্তই বিবেকের আদর্শসঞ্জাত। কারণ কেশবচন্দ্র চাইছিলেন 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' অর্জন করতে। প্রথমত, সপ্তাহান্তে একবার মাত্র উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য সমাধান করাতেই কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত নয়, প্রতিদিনের জীবনে প্রতিক্ষণে আপন অন্তরে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানানুভবের ও উপাসনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন।

দ্বিতীয়ত, মহর্ষির নির্ভর ছিল একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র তৎকালে সারা পৃথিবীতে যে-ধর্মপ্লাবন বয়ে চলেছিল, তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। থিয়োডোর পার্কার এবং নিউম্যানের দর্শনচিন্তা তখন এ-দেশে ধীরবিস্তার লাভ করছিল। বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের ঔদার্য কেশবচন্দ্রকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কাজেই যেখানে বিশ্বধর্মের ঔদার্য গ্রহণ করা বিধেয়, সেখানে শুধুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রসর্বস্বতা তাঁর কাছে সংকীর্ণতা মনে হয়েছিল।

বিরোধের তৃতীয় কারণটি অধিকারবোধপ্রসূত। ট্রাস্টের বয়ানের বলে দেবেন্দ্রনাথ উপাচার্যাদি নিয়োগের সর্বকর্তৃত্ব আপন হাতে নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই ক্ষমতা গ্রহণের অন্যতর একটা কারণও ছিল। দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা শেষে কেশবচন্দ্র একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মণ্ডলী স্থাপনে উদ্যোগী হন যা বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধর্মসমাজগুলির মধ্যে যোগ স্থাপন করবে। ১৮৬৫তে বঙ্গদেশে একটি প্রতিনিধি সভাও স্থাপিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতই আতঙ্কিত হলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রতিনিধি সভার হাতে চলে যাবে। কাজেই তিনি ট্রাস্টির ক্ষমতা আরোপ করলেন। কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় এর সমালোচনা করলেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে হিন্দুদৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষির সঙ্গে আপাত খ্রিস্টানদৃষ্টিসম্পন্ন কেশবচন্দ্রের বিরোধ ক্রমে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

কেশবচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রথম আত্মপ্রকাশ করল জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সকলে যেহেতু ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং অধিকার সকলেরই সমান। কাজেই ব্রাহ্মসমাজে কেবলমাত্র সূত্রধারী ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন। মহর্ষি যুগদাবিকে অঙ্গীকার করে নিলেন। আপাতত নিজে প্রধান আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত থেকে অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে উপাচার্যগণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।[১] এই বিপ্লবাত্মক ঘটনার তারিখটি— ১৩ এপ্রিল ১৮৬২। সূত্রধারী ব্রাহ্মণেরা বেদিতে বসার সময় বাধ্য হয়ে সূত্রত্যাগ করতেন। একটি চাপা অসন্তোষ তাঁদের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকল। দেবেন্দ্রনাথও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের ন্যায় স্বয়ং উপবীত ত্যাগ করলেন।

এই পরিবর্তনকে দেবেন্দ্রনাথ সংগত কারণে সহ্য করে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল স্রোতাবেগে অগ্রসরমাণ যুবকবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজে নিত্যনূতন পরিবর্তনমুখী আন্দোলন উপস্থিত করতে লাগলেন। জাতিভেদপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদীকরণে তাঁরা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করতে চাইলেন এবং প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিতও হয়ে গেল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের কাছে এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হলো। দেবেন্দ্রনাথের সহনশক্তি সীমা অতিক্রম করল। ট্রাস্টের অধিকারবলে তিনি সূত্রধারী ব্রাহ্মণদের পুনরায় বেদিতে বসালেন। মহর্ষির সাধুপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষণশীল দলের সঙ্গে উন্নতিশীল দলের পার্থক্য লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়ে চলল। কারণ মহর্ষি কেশবচন্দ্রের এই অগ্রগতির সঙ্গে হিন্দু আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হতে প্রত্যক্ষ

১. দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপবেশন করতে সর্বদা কুণ্ঠিত হতেন। গৃহস্থ মানুষের গুরুগিরি করা তিনি বিধেয় নয় ভাবতেন। রামমোহনও কোনোদিন আচার্যর কাজ করেননি। মহর্ষি বেদির নীচে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মধ্যে ধর্মাচার্যের যোগ্যতা দেখে তাঁকে বেদিতে বসান। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের বেদির নীচে উপবেশনকে ভালো মনে করতেন না। মনে রাখতে হবে, এই কেশবচন্দ্রই মহর্ষিকে একদিন জোর করে বেদিতে বসিয়ে দেন। তখন থেকেই আত্মবিশ্বাসে শক্তিমান দেবেন্দ্রনাথ প্রতি বুধবার বেদিতে বসে ব্যাখ্যান দিতে আরম্ভ করেন। তারিখটি ২৫ জুলাই ১৮৬০।

করলেন। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোনো প্রকার আপোস চাইতেন না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের গতি হিন্দু আইন ও প্রথানুযায়ী পরিচালিত হবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

কাজেই মহর্ষির সঙ্গে নব্যপন্থীদের সংশ্রব রাখা আর সম্ভব হলো না। অবশ্য তাঁরা মহর্ষির কাছে সসূত্র ব্রাহ্মণদের বেদিতে বসানোর জন্য প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে লিখলেন—

> আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্য্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব; পত্রিকার দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয় তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয় তবে ইহার উপায় নাই. . . তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিয়া এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি?[১]

কেশবচন্দ্র উত্তরে লিখলেন—

> . . . আপনি যেন আমাকে পৃথক করিয়া দিলেন. . . ইহা নিশ্চয় জানিবেন যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের কার্য্য করিতে হইবে, ততদিন কেহ কাহাকে মৌখিক বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না. . .
>
> . . . আমি যে নির্য্যাতন করিতেছি তাহা আমি অস্বীকার করিব

১. মূলপত্র দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৭৮৭ শক, ২৬৪ সংখ্যা।

> না। কিন্তু আপনাকে নহে, আপনার মত ও সংস্কারকে নির্য্যাতন করিতেছি। তজ্জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করুন। আমি তাঁহার আদেশ ভিন্ন তাহা হইতে বিরত হইতে পারি না। যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্য্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মকে নির্য্যাতন করা যেমন কর্ত্তব্য, উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টাকে নির্য্যাতন করা তেমনি কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর জানেন যে আমি আপনাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।. . .[১]

অনিবার্যভাবে বিচ্ছেদ এসে গেল। মহর্ষি রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয় ব্রাহ্মদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের যে-চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। এর ফলে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (Brahmo Samaj of India) প্রতিষ্ঠিত হলো। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এই নতুন সমাজের কথা সবিস্তারে আলোচনা করব। কিন্তু এই বিচ্ছেদের প্রাক্‌মুহূর্তে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের কাছে এক প্রতিবাদপত্র পেশ করলেন। বরং বলা ভালো, চরমপত্র পাঠালেন। সেই পত্রে স্বাক্ষর করলেন—

১. কেশবচন্দ্র সেন
২. উমানাথ গুপ্ত
৩. মহেন্দ্রনাথ বসু
৪. যদুনাথ চক্রবর্তী
৫. নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং
৬. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

---

১. — এখানে পত্রের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত, মূলপত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য— কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ (১৩৬৩), পৃ. ৯২-৯৩।

পত্রে শেষোক্ত পাঁচজন কেশবচন্দ্রকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখবার জন্য ২১ আষাঢ় ১৭৮৭ শক মঙ্গলবার বিকেল ১টার সময় দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। দীর্ঘকাল ধরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের যে মঙ্গলসাধন করে এসেছেন, সে-কথা পত্রে তাঁরা স্বীকার করেছেন এবং এ-কথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষ এখনকার বিবাদের মূলীভূত কারণ।'[১]

তবে পরিবর্তন আসে, গতিশীল বস্তুর ধর্মই এই। সেই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পত্রে আরও উল্লিখিত হয়েছে—

> সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী অপ্রশস্ত ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলহ কোন বৈষয়িক ব্যাপার-সম্ভূত নহে, ইহা স্বার্থপরতা-নিবন্ধন বৈরভাবমূলকও নহে। এই ধর্ম্মোন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম— ইহা নব্য-ব্রাহ্মদিগের হৃদিস্থিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ।

কী প্রকারের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় সে-সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাবও এই পত্রে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমত, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য উপাচার্য বা অধ্যেতা, কেউ-ই কোনো সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোনো চিহ্ন ধারণ করবেন না। দ্বিতীয়ত, সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মরাই কেবল বেদির আসনের অধিকারী হবেন। এবং তৃতীয়ত, 'ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের

১. এই পত্রধারার পাঁচখানি চিঠি দ্রষ্টব্য, মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৬৫, পৃ. ৬৯-৭০।

উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিদ্বেষ, সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য থাকিবে।'

পরিশেষে মতান্তরক্ষেত্রে ভিন্ন সমাজ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে উক্ত পত্রে লেখা হয়েছে (পত্র লেখার তারিখ ১৯ আষাঢ় ১৭৮৭ শক)—

> যদ্যপি উপাসনা সম্পর্কে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপরদিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন, ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কেশবচন্দ্র ভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু এ-কথা মনে করা ভুল হবে যে, মহর্ষির সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মনোমালিন্য উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কালিমালিপ্ত করেছিল। বরং উভয়ে উভয়কে কতখানি ভালোবাসতেন তা ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা চিঠিগুলি থেকে প্রমাণিত হয়।[১]

অবশ্য কেশবচন্দ্র এই বিচ্ছেদে যে কী পরিমাণ দুঃখ পেয়েছিলেন ২৫ মাঘ ১৭৮৬ শক তারিখে তাঁর কলুটোলা বাসভবন থেকে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি পত্রের প্রতি ছত্রে তা উদ্ধৃত আছে:

> . . . আমাকে যেরূপ সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্ম্মচারীগণ আমার সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার

১. দ্রষ্টব্য, মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৫, পৃ. ৭৫৭।

> করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।. . . যে সমাজের কার্য্য অনুগত ভৃত্যের ন্যায় এতদিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল।. . .[১]

৪

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এই ঘটনার পর থেকে দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে অনেকখানি সংযত করে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে অবসৃত হন এবং ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপাসনায় গভীরভাবে মগ্ন হন। ফলে আদি সমাজ আরও মন্থরগতিসম্পন্ন হয়ে যায়। রামচন্দ্র বসু ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের আচার্যত্বে ও শম্ভুনাথ গড়গড়ির উপাচার্যত্বে আদি সমাজের কার্য বাহিত হতে থাকে।

এই সময়কালের মধ্যে আদি সমাজের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে আমরা রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে রবীন্দ্রনাথকে পাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের গতিমন্থরতা দেবেন্দ্রনাথ নিজেই আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর পত্রে তিনি এক স্থানে লিখেছেন, 'তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারাও তোমাঁদের সাহায্যের অভাবে আরও মৃদুগতি হইবেন।'[২]

'ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়েছিল হিন্দুসমাজের বহুকালের কদাচার ও

১. দ্রষ্টব্য, মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৫, পৃ. ৭৫৭।

২. দ্রষ্টব্য— কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃ. ৯৩, পাদটীকা।

গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিকাশধর্মের অকৃত্রিম তাগিদে। কিন্তু সেই বিকাশধর্ম পূর্ণ-স্বীকৃতি পেল না মন্থরগতি ব্রাহ্মদের কাছে। সর্বান্তঃকরণে বিকাশধর্মী মানুষ না হয়ে তাঁরা হতে চাইলেন ভব্য হিন্দু— অন্তত কিছুকালের জন্য। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এমন শিথিলতা কখনও প্রশ্রয় পায়নি।"[১]

১. দ্রষ্টব্য— কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃ. ৯৩-৯৪।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

১৮৬৬-১৮৭৮

দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করে এসে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কেশবচন্দ্রকে বক্তৃতা ইত্যাদির সুযোগ নিতে হলো। স্বপক্ষে লোকমত গঠনের জন্য তিনি 'ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রাম' শীর্ষক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাকালে খ্রিস্টান পাদরিরা উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম অধিনায়ক দিগম্বর মিত্র (এঁরা কেউই ব্রাহ্ম ছিলেন না) উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার উপাসক এই দুই ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করলেন দেশের শিক্ষিতসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে।

বিরোধের কারণগুলি সংক্ষেপে কেশবচন্দ্র এইভাবে নির্দেশ করেছেন—

> কলিকাতা সমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্ম্মকে সংসারের ধর্ম্ম করিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম করিয়াছেন; বিবেকের স্থলে ফলাফল চিন্তা, বীরত্ব ও ঐকান্তিকতার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন; সত্যকে সংসারের দাস করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্মানার্থ বেদী স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা সমুচিত, অন্যথা মহাবিপ্লব ঘটিবে। সত্যকে

কখনও কেহ দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সমুদয় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীন হইবেই হইবে।[১]

এই বক্তৃতার কাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্র ভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগের পর তাঁর দুটি কর্মোদ্যোগ ভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করল। স্বদেশের উন্নতির ব্যাপারে নারীর যে একটি প্রধান ভূমিকা আছে এ-কথা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে একটি মহিলা সম্মেলন (লক্ষণীয় যে, এই প্রকারের সম্মেলন এ-দেশে এই প্রথম) অনুষ্ঠিত হয়। অনুমান করি, এই সম্মেলন থেকেই 'ব্রাহ্মিকা সমাজ'-এর উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয়ত, Calcutta Medical College Theatre-এ তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'Jesus Christ: Europe and Asia'[২] দান করলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে তারিখে। এই বক্তৃতা কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের কাছে অধিকতর অপ্রিয় করে তুলল। দেবেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টানুরাগ লক্ষ করে বিরূপ সমালোচনা করলেন। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানগণ ভেবে বসলেন, কেশবচন্দ্র বুঝি বা খ্রিস্টান হয়ে যাবেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স আগ বাড়িয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁর আশায় ভস্ম নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টান ধারণা সম্পর্কে কিছুটা প্রমাদগ্রস্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। যে-বক্তৃতার কারণে দেবেন্দ্রনাথ বিরূপ হয়েছিলেন, সেই 'Jesus Christ: Europe and Asia' শীর্ষক বক্তৃতাটি কেশবচন্দ্র

---

১. বিপিনচন্দ্র পাল, 'নবযুগের বাংলা' (২য় সংস্করণ, ১৯৬৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯৯।

২. প্রকাশকাল, ১৮৬৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

খ্রিস্টের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের বশে প্রদান করেননি। এর একটা পশ্চাদেতিহাস আছে। এই বক্তৃতা প্রদানের কিছুদিন পূর্বে আর. স্কট. মনক্রিফ নামে একজন বিলাতি সওদাগর বাঙালি চরিত্রের প্রতি অন্যায় ও অযথা কটাক্ষ করে বক্তৃতা দেন, কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতা আসলে সেই বক্তৃতারই পরোক্ষ প্রতিবাদ। বক্তৃতায় মনক্রিফের নামের উল্লেখ না থাকলেও কেশবচন্দ্র জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যিশুখ্রিস্টের আসল স্বরূপ কী, এবং খ্রিস্টানরা কী দৃষ্টিতে তাঁকে ভজনা করেন। কেশবচন্দ্র বললেন, 'In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism. I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand, dishonest flattery on the other.'[১]

যাই হোক, এই ভুল বোঝাবুঝি দেখে ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য কেশবচন্দ্র উক্ত খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে 'Great Men'[২] শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন। শুধু তা-ই নয়, কেশবচন্দ্র অচিরে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের গুরুত্ব নিয়ে (যে-কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) নানা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন 'Indian Mirror'[৩] পত্রিকায়। বার বার এই সভার অধিবেশন চলতে থাকে। শেষে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর তারিখে

১. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃ. ১০৪।

২. প্রকাশ ১৮৬৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

৩. প্রথম প্রকাশ ১ আগস্ট ১৮৬১। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি কেশবচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১. ১. ১৮৬৯ থেকে এটি সাপ্তাহিক এবং ১. ১. ১৮৭১ থেকে দৈনিকে পরিণত হয়। পত্রিকার শিরোভূষণ ছিল 'Voluti in Spe wiur'— অর্থ 'As from Watch Tower'।

প্রতিনিধি সভার যে-গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়, সেই সভার কার্যক্রমানুসারে উক্ত তারিখে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ('Brahmo Samaj of India') প্রতিষ্ঠিত হলো।

২

কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনযোগ্য। এই নামকরণ কেশবচন্দ্রের চিন্তার ব্যাপকতাকে সূচিত করে— অন্তত ধর্মক্ষেত্রে। কারণ এই সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গুরুত্ব ব্রাহ্মসমাজে ততখানি স্বীকৃত হয়নি। এই স্বাধীনতার ব্যাপারে অবশ্য আলোচনা চলছিল British Indian Association-এ। এই কালের মধ্যে কেশবচন্দ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু উত্তর ভারত দেখেননি। (পরবর্তীকালে উত্তর ভারত ভ্রমণের জন্য ৭. ১. ১৮৬৭ তারিখে বর্ধমান থেকে পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লি ও মুঙ্গের হয়ে ১৫. ৪. ১৮৬৭-তে কলকাতায় ফিরে আসেন। শিখ সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিকতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল— প্রমাণ ১৯. ১২. ১৮৬৭ তারিখে বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর 'A visit to the Punjub' নামক বক্তৃতাটি)। কিন্তু তিনি ধর্মক্ষেত্রে ভারতের সমগ্রতা বা ঐক্য দেখতে পেলেন আপন চিন্তার মধ্যে। এই ঐক্যচিন্তার ফলশ্রুতিই এই বিশেষ নামটি 'Brahmo Samaj of India'— ভারতীয়তা বোধের বীজমন্ত্র।

শুধুমাত্র ভারতীয়তাই বা বলব কেন? দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুশাস্ত্র সর্বস্বতা কেশবচন্দ্রের ভালো লাগেনি। তাই দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থোদ্ধৃত শ্লোক সংগ্রহকে তিনি একটা বিশ্বজনীন রূপ দিতে চাইলেন। দেবেন্দ্রনাথের

সংগ্রহসূত্রকে অবলম্বন করে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য 'শ্লোক সংগ্রহ' সংকলন করলেন।[১] এই সংকলনে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি সকল ধর্মের সারকথা গৃহীত হলো। বলা যেতে পারে, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে একটা বিশ্বজনীন উদার সমন্বয়ী ধর্মের প্রতিষ্ঠা হলো। শুধু তা-ই নয়, এই চিন্তাই শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে সকল ধর্মের মধ্যেই যে সত্য নিহিত আছে, তা বুঝতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে 'কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মকে একটা অতিবড় স্বাধীনতার সনন্দ প্রদান করেন।'[২] ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ ধর্ম সাধন করেও বিশ্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রকে নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। যাই হোক, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট, বাংলা ৬ ভাদ্র তারিখে সাড়ম্বরে এই মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হয় (৯৫ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, বর্তমানে কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট)। সারাদিনব্যাপী উপাসনা হয়। নরনারীর সমানাধিকার স্বীকৃতি পেল ('নরনারী সকলের সমান অধিকার')। ওইদিন সন্ধ্যাকালীন উপাসনার পূর্বে ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য), কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ একুশজন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন।[৩] এঁরা ব্যতীত দুজন মহিলাও দীক্ষা গ্রহণ করলেন— একজন আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু ও দ্বিতীয়জন

---

১. 'ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ' (বঙ্গানুবাদসহ)— ১৮৬৬, পৃ. ৬৪। প্রথম সংস্করণ কেশবচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত; পরে তাঁর অনুবর্তীগণ কর্তৃক ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত, পৃ. ৪৬৮।

২. বিপিনচন্দ্র পাল, *নবযুগের বাংলা*, পৃ. ১২৫।

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত'-এ (সিগনেট সংস্করণ, পৃ. ৯৫-৯৬) লিখেছেন, 'আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কিনা। আমি বলিলাম, প্রকাশ্য দীক্ষাটা তো বাড়ার ভাগ, আমি তো ব্রাহ্মই আছি। যাহা হউক, অপরাপর যুবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষা গ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে আমরা ২১ জন যুবক দীক্ষিত হইলাম।'

কেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের ন-বছরের পত্নী যাদুমোহিনী দেবী। সমাজের প্রধান উপদেষ্টা হলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। সে-দিনে মন্দিরের উপাসনা ও বক্তৃতার ভাষা ছিল বাংলা।[১] স্বদেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ অনুরাগের বর্ষণে মন্দির পবিত্র হলো।

৩

গতিবাদের একটা বড়ো সূত্র হলো যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কার্যাবলী উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা লক্ষ করেছি। এটা কারও দোষ বা গুণের অভিব্যক্তি নয়, পরিবর্তনশীলতা প্রগতির আর এক নাম। কেশবচন্দ্রও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ত্বরণ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কারণ পারা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর খানেক আগে থেকেই একটি কেশববিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়। দেশব্যাপী এই আন্দোলন কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'নরপূজার আন্দোলন' নামে খ্যাত। (এই আন্দোলনে শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন)। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে এই আন্দোলনের ঝড় ওঠে। মতান্তরের প্রসঙ্গটি এই যে, কেশবচন্দ্র নাকি তাঁর অনুগতবর্গ কর্তৃক 'প্রভু', 'ত্রাণকর্তা' ইত্যাদি সম্ভাষণে সম্বোধিত হচ্ছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্রের

১. বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কেশবচন্দ্রের বাংলা বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সমাজে মাঝে মাঝে যেতেন, দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৯ম খণ্ড, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪।

দল ত্যাগ করে বাঘ-আঁচড়ায় নিজের বাড়িতে চলে যান। মনে রাখতে হবে, এই বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অপরাধে স্বগ্রামে নিরতিশয় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হলেন।

কিন্তু আদি সমাজ কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠলেন। রাজনারায়ণ বসু এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি "এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব দেখিয়া. . . তাহার বিপক্ষে 'Brahmic Advice, Caution and Help' "[১] নামক একটি পুস্তিকা প্রচার করতে বাধ্য হন। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, পায়ের ধুলো কেউ শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে নিলে তাতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না, "কিন্তু উহাকে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ করার প্রতি আমার বিশেষ আপত্তি আছে।. . . কেশববাবু যখন সিমলায় যান তখন মুঙ্গের হইয়া যান, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করেন। প্রথমে সেই স্থানে তিনি অবতার হয়েন। তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, 'ভক্তির স্রোত আমি বন্ধ করিতে চাহি না'।"[২]

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী না হলেও অচিরে ভিন্নতর আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজে পুনর্বার ভাঙন ধরানোতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজে 'প্রেরিত মহাপুরুষবাদ'-এর আন্দোলন দেখা দিল। কেশবচন্দ্রকে পুনর্বার সমালোচনার সম্মুখীন হতে হলো এবং ফলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হলো না। কেশবচন্দ্রের এই ভক্তিবাদ শেষ পর্যন্ত তাঁর অতিঅনুগত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শীঘ্রই আমরা সে-কথার আলোচনায় নিযুক্ত হব।

---

১ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ ৮৫।

২ তদেব, পৃ. ৮৬।

কেশবচন্দ্রের ভক্তিবাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অমৃতবাজার গোষ্ঠীর মধ্যে। এই ভক্তিবাদ আবার ভারতীয় ভক্তিবাদ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টপ্রীতির অপবাদ ব্রাহ্মসমাজের একাংশের মধ্যে প্রবল ছিল। মিশনারিদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বাইবেলপাঠ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্টভাবসম্মত অনুতাপ ও প্রার্থনা তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলল। পাপবোধপ্রণোদিত ও অনুতাপব্যঞ্জক সংগীতাদি রচিত হতে থাকে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সূত্রে উন্নতিশীল দলে বৈষ্ণবকীর্তনসম্মত ভাব অনুপ্রবিষ্ট হলো।

কেশবচন্দ্রের চরণাশ্রয় এবং অনুতাপ-প্রার্থনা-ব্যাকুলতা-প্রকাশক সংগীতাদি শ্রবণে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের একাংশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই বিরক্ত শ্রেণির দর্শন হলো— সমগ্রজীবকুল পরমকারুণিক ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর এই ঈশ্বর হলেন আনন্দস্বরূপ— আনন্দরূপম্। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিও আনন্দময়। তবে 'প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও'— এই ছিল তাঁদের প্রচার। অন্য ব্রাহ্মরা এই দলকে 'আনন্দবাদী' দল বলতেন। অমৃতবাজার গোষ্ঠীর শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন এই দলের প্রধান ব্যক্তি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সময় মুঙ্গের-প্রত্যাগত একজন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা শুরু করলে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তকুমার ঘোষ বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করলেন এবং সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। বিরক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও তাঁকে অনুসরণ করলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'ইহার পর হইতে শিশিরবাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।'[১] সে-ইতিহাস ভিন্নতর।

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১০২।

এই সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি, অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের মধ্যেই মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৪

১৮৭০-৭২ সাল— অন্তত এই তিন বছরের হিসাবনিকাশ করলে দেখা যাবে কয়েকটি ছোটোখাটো মনোমালিন্য ব্যতীত সাধারণভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কোনো তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। এর দুটি কারণ অনুমান করি— এক. ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের বিদেশ গমন, ও দুই. বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্র প্রচারিত বিভিন্ন ও বিচিত্র নিশ্ছিদ্র কর্মজালের বিস্তার।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাঁচজন[১] সঙ্গীসহ কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তাঁর বিলাত যাওয়ার প্রাতিপদিক উদ্দেশ্য ছিল। সমগ্রভাবে ইংরেজদের গুণাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে স্বদেশীয় চরিত্রে সেগুলিকে আরোপ করা। সাত মাস ধরে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন উপায়ে ইংল্যান্ডকে জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রাণ ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া কেশবচন্দ্র ম্যাক্সম্যুলর, জন স্টুয়ার্ট মিল, মিস মেরি কার্পেন্টার প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। এমনকী ১৩ আগস্ট ১৮৭০ রানি ভিক্টোরিয়ার আগ্রহে কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনুমিত হয় ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মিস মেরি কার্পেন্টার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায়

---

১. পাঁচজন সঙ্গী হলেন— শ্রীঅরবিন্দর পিতা ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রাখালচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র রায় এবং প্রসন্নকুমার সেন।

কেশবচন্দ্র বক্তৃতা প্রদান করেন। মোটকথা, ইংল্যান্ডে থেকে কেশবচন্দ্র ইংরেজদের মজ্জার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। ২০ অক্টোবর ১৮৭০ তারিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে জাতীয় উন্নয়নের জন্য ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে রূপ দিতে চাইলেন। কারণ ধর্মগত বা আত্মিক উন্নতি ব্যতীত সামাজিক উন্নতির প্রতিও ব্রাহ্মসমাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই প্রকারের চিন্তা ধর্মবিবিক্ত চিন্তা নয়; কারণ চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে ঈশ্বরচিন্তায় কোনো ফল ফলে না, এ-কথা তাঁরা জানতেন।

সেজন্য ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসেই কেশবচন্দ্র বাংলার সমাজ ও বাঙালির মানসসংস্কারে অগ্রণী হলেন। ২০ নভেম্বর ১৮৭০ তারিখে তিনি বহুখ্যাত 'ভারত সংস্কার সভা' বা Indian Reform Association (লক্ষণীয়, বাংলা নয়, ভারত) স্থাপন করলেন।

এই সভার পাঁচটি প্রধান·বিভাগ। প্রত্যেকটি বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক একজন করে নির্বাচিত হন:

১. স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক বিভাগ
সম্পাদক: উমেশচন্দ্র দত্ত

২. শিক্ষা বিভাগ: শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয়
সম্পাদক: প্রথম বর্ষে জয়কৃষ্ণ সেন
দ্বিতীয় বর্ষে অমৃতলাল বসু ও কৃষ্ণবিহারী সেন

৩. সুলভ সাহিত্য প্রচার
সম্পাদক: উমানাথ গুপ্ত

৪. সুরাপান ও মাদকনিবারণ শাখা
সম্পাদক: যাদবচন্দ্র রায়
দ্বিতীয় বর্ষে কানাইলাল পাইন

৫. দাতব্য বিভাগ
সম্পাদক: কান্তিচন্দ্র মিত্র

প্রধান এই পাঁচটি শাখার মধ্যে বহু আনুষঙ্গিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অচিরকাল মধ্যে সবগুলি বিভাগের কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়ে গেল। ইংল্যান্ড বাসকালে কেশবচন্দ্র সে-দেশে যে-আন্দোলনের আবর্ত লক্ষ করে এসেছিলেন, দেশে তার ঢেউ বইতে আরম্ভ করল। সে-ঢেউ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঢেউ।

স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রথম বিভাগে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা (১৪. ৪. ১৮৭১) প্রভৃতি স্থাপিত হলো।

টেকনিক্যাল এডুকেশন বিভাগের (স্থাপনা ২৮. ১১. ১৮৭০) শিল্পবিদ্যালয়ের যে-শিক্ষণীয় বস্তুগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়— ১. সূত্রধরের কাজ ২. সূচীকর্ম ৩. ঘড়ি মেরামত ৪. মুদ্রাঙ্কন ও লিথোগ্রাফ ৫. এনগ্রেভিং বা খোদাইয়ের কাজ প্রভৃতি। আর শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়াদি ছিল— ১. ভাষা ২. গণিত ৩. সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল ৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস ৫. বস্তুবিচার ৬. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ৭. নীতি শিক্ষা। শ্রমজীবীদের জন্য এই প্রকারের বিদ্যালয় ভারতবর্ষে এই প্রথম। এটি ইংল্যান্ডীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত।

দেশের অধিকাংশই যে কৃষক-মজুর এই সত্য কেশবচন্দ্রের সত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বলেই কেশবদীক্ষিত ব্রাহ্মযুবক সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] ইতিমধ্যে মিলশ্রমিকদের শিক্ষার জন্য কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং শ্রমিক সংঘের মধ্যে সঞ্চয়প্রকৃতি জাগাবার জন্য একটি

১. শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত শ্রমজীবী' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই ধরনের পত্রিকা এ-দেশে প্রথম। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমজীবীদের উদ্দেশে যে-কবিতা রচনা করেন, তা 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা'র ১ ও ১৬ চৈত্র ১৩৭৪ সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

'আনা ব্যাঙ্ক' (Anna Bank— প্রতিদিন এক আনা জমানো) স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতে স্থাপিত প্রথম বিধবাশ্রমে বিধবাদের শিক্ষাদান ও রোজগারের উপায়ও তিনি নির্ধারিত করেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রমিক আন্দোলনের মূল কারণগুলি সম্পর্কে যত্নশীল ছিল, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুলভে সাহিত্য প্রচার দ্বারা জনমানসকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ কম ছিল না। ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ তারিখে এক পয়সা মূল্যের (দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে দু-পয়সা) সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশের দ্বারা এই কাজের সূত্রপাত হয়। এত কম মূল্যে কোনো পত্রিকা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। দেশবিদেশকে সাধারণের নিকটবর্তী করে তোলাই এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। সহজ ভাষার ব্যবহার ও প্রচারের দ্রুততা সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলেছিল। নির্যাতিত শ্রেণি এতদিনে তাদের নিজেদের কাগজ হাতে পেল। 'সুলভ' তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাল। আর এ-কথা বলা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, কেশবচন্দ্র এইভাবে ব্রাহ্মধর্মকে সাধারণ শ্রেণির মধ্যে প্রচারিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্ধমান জেলা সম্পর্কে W. W. Hunter তাঁর 'Statistical Account of Bengal' (Part V, p. 54) গ্রন্থে বলেছেন, 'The Collector, however, in his report to me in 1870, estimated the total number of Brahmos at above one-eighth of the whole District population.'[১] অতিশয়োক্তির সংশয় পোষণ করেও বলা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম এই জেলার গ্রামের মজুর, কৃষাণ সকলের মধ্যেই অনুপ্রবেশের পথ খুঁজে নিয়েছিল।

---

১. অতুল গুপ্ত সম্পাদিত 'Studies in Bengal Renaissance' গ্রন্থে যোগানন্দ দাসের প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

এই প্রসঙ্গে আবার আমরা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করছি। এই বিভাগের অন্তর্গত 'ভারত শ্রমজীবী' (১৮৭৪) পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বিস্ফারিত নয়নে লক্ষণীয়— তার পঞ্চাশ সহস্র সংখ্যা প্রচারিত হতে থাকে। শশীপদবাবু[১] যখন বিলাতে অবস্থান করছিলেন তখন ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য একটি আইন পাস করানোর চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সফল হতে পারেননি। দেশে ফিরে তিনি বরানগরের শ্রমিকদের নিয়ে নগরসংকীর্তনে বের হতেন। ঐক্যবদ্ধ এই জনগণের সংকীর্তন ভ্রমণ করতে করতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে অবশেষে শোভাযাত্রাসহ মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছত।

চতুর্থ বিভাগটি 'সুরাপান ও মাদকদ্রব্যনিবারণ' বিষয়ক। মনে রাখতে হবে, এই প্রচারের প্রতিষ্ঠান এটি প্রথম নয়। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অধিকাংশ ব্যক্তিকেই মদ্যপানে গভীরভাবে আসক্ত দেখে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করছিলেন। রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন[২] 'তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।' যাঁরা এঁদের চেয়ে নরমপন্থী, তাঁরা পরিমিত পরিমাণে মদ্যপানের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। শীঘ্রই এর কুফল হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন। স্বয়ং রাজনারায়ণই মদ্যপান নিবারণার্থে মেদিনীপুরে 'সুরাপান-নিবারণী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। 'উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত সুরাপান-নিবারণী সভা।'[৩] সভাটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ ছিলেন, মনে রাখতে হবে, একজন কট্টর ব্রাহ্ম। (এর পর

---

১. এই শশীবাবুর সহধর্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয় মহিলা; ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।।

২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ২৬।

৩. তদেব, পৃ. ৫২।

এডুকেশন গেজেট-সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি মদ্যপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।) ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় উদ্যোগ সংগঠিত হয় কেশবচন্দ্রের 'ভারত সংস্কার সভা' কর্তৃক। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্য-পদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত।" [১] তা ছাড়া কেশবচন্দ্র মদ্যপান নিবারণের জন্য তদানীন্তন বড়োলাটের কাছে আবেদন করলে সরকার কয়েকটি বিধি প্রবর্তন করেন। এতে পরিতৃপ্ত না হয়ে তিনি সুরাপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য তরুণদের নিয়ে 'আশালতা দল' (Band of Hope) গঠন করলেন। মাঝে মাঝে পুস্তিকাদি প্রচারিত হতে লাগল।

কাজেই ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার (আপাতত দুই শাখার) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুরাপানের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা থেকে তাঁদের স্বদেশপ্রেম ও নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়।

'ভারত সংস্কার সভা'র পঞ্চম বিভাগের কার্য ছিল দাতব্য। দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক সাহায্য, অন্ধ, খঞ্জ ও বধিরদের অর্থদান, বিধবা ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে নিয়মিত মাসিক সাহায্যপ্রদান, ঔষধপত্র বিনামূল্যে বিতরণ প্রভৃতি এই বিভাগের সূচিভুক্ত কর্ম ছিল।

কাজেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই ভারত সংস্কার সভাই ভারতবাসীর উন্নতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে এই সভার কার্য পরিচালিত হয়েছে।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে কেশবচন্দ্র ইংরেজদের 'হোম' প্রথার (English type of home) প্রতি খুবই অনুরক্ত হন। তারই অনুকরণে তিনি ১৩ মির্জাপুর

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১০৭।

স্ট্রিটে (পরে বেলঘরিয়ার বাগানে এবং আরও পরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে) 'ভারত আশ্রম' স্থাপন করেন। আত্মত্যাগী ব্রাহ্মেরা এখানে সপরিবারে বাস করতে পারতেন। ব্রাহ্মদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদানে ও ঐক্যবিধানে এই আশ্রম খুবই ফলদায়ক হয়েছিল।

এই সভা, সর্বোপরি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পুষ্টিদানে সর্ববিধ প্রযত্ন গ্রহণ করেছিল। দুটি ঘটনার উল্লেখ আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করবে।

এক. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বগ্রাম বাঘ-আঁচড়াতে স্বয়ং বাজারের সবজিওয়ালাদের একশোজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ-কথা সর্বজ্ঞাত যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাতি-ধর্ম নির্বিচারে ব্যক্তিমানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিক্ষা দেয়।

দুই. দ্বিতীয় ঘটনাটির চমক আরও দ্যুতিময়। প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন আনন্দস্বামী ও কালীনারায়ণ গুপ্ত। তাঁরা পূর্ববঙ্গে নিজেদের জমিদারিতে ধর্ম প্রচার করেন। কালীনারায়ণ গুপ্ত লোকসংগীত রচনা করে তাঁর চাকর-পাইক-বরকন্দাজদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের এক মাঘোৎসবে (১৮৭১?) যাঁরা উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন, তাঁরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন, কালীনারায়ণের ভৃত্য বেদিতে উপবিষ্ট এবং ভক্তিমান প্রভু কালীনারায়ণ গুপ্ত সেই বেদির নীচে বসে আছেন।

একে উগ্রতা বা বাতিকগ্রস্ততা বলে লঘু করে দেখলে চলবে না: ব্যক্তিশ্রদ্ধার ঢেউ এমনই উত্তাল হয়েছিল। সে-ঢেউয়ে ভেদবিচারের অবকাশ কোথায়?

৫

'ভারত সংস্কার সভা'র প্রতিষ্ঠা-কারণে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ যেমন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল বৎসর, তেমনি মহাগুরুত্বপূর্ণ বৎসর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ।

কারণ এই বছরেই কেশবচন্দ্র যেমন তাঁর পারিষদগণ কর্তৃক সমর্থনের তুঙ্গে আরোহণ করেছিলেন, তেমনই এই বছর থেকেই তাঁর অনুগতদের একাংশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিবাদের মৃদু সমীরণ ক্রমে উত্তাল তুফানের রূপ গ্রহণ করে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তুলেছিল।[১]

মতান্তরের প্রসঙ্গটি দ্বিবাহু সমন্বিত। দুটি ঘটনাই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা এদের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। কারণ প্রথম ঘটনাটি সামাজিক কারণপ্রসূত এবং তা ভবিষ্যৎকালের সমাজবিধিকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট চরিত্রটিকে তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি স্বাধীনতা আন্দোলনপ্রসূত— সে-কারণেই সমাজনিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এতে সক্রিয়— যা সৃষ্টিমুহূর্ত থেকে ব্রাহ্মসমাজকে নানা পরিবর্তনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে গতিদান করেছিল।

প্রথম ঘটনাটি ব্রাহ্মবিবাহবিধি আন্দোলন সম্পর্কিত।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের 'তিন আইন' (Act III of 1872) নামে ব্রাহ্মদের বিবাহকে বিধিসম্মত করার জন্য যে-আইন প্রণীত হয়েছিল, তার ইতিহাসই আমরা আলোচনা করছি। এর অর্থ এই নয় যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ব্রাহ্মবিধিমতে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং এই সংবাদ পরিবেশন করা যেতে পারে যে, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিবাহবিধি আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই অন্তত দুটি বিবাহ ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয়

১. এ-পর্যায়ে আমরা প্রথম ঘটনাটি আলোচনা করছি। দ্বিতীয় ঘটনাটি পরবর্তী পর্যায়ে (১৮৭২-৭৮) আলোচনা করব।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। বিবাহ হয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুকুমারীর সঙ্গে রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক, ২১৬ সংখ্যা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, উপস্থিত বহুলোকের মধ্যে দু-শোজন ব্রাহ্মও ছিলেন। পাত্র অভ্যর্থনার পর একটি 'ব্রহ্ম বিষয়ক' গান হয়। তারপর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ পাত্র-কন্যাকে উপদেশ দেন। দেবেন্দ্রনাথও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, '১৭৮৩ শকে [১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল] আমার কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধানমত প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রথম অনুষ্ঠান— ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রথম ফল।' এর পরে আরও কয়েকটি বিবাহ ব্রাহ্মমতে নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয় উল্লেখ্য (দ্বিতীয় নয়) বিবাহটি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার। দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহটিকে অভিনন্দিত করেছিলেন।[১]

'বিবাহ' ব্যাপারটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই হিন্দুসমাজেও একটি অত্যাজ্য সংস্কার। হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠান নানা প্রকার লোকাচার ও বাহ্যসংস্কারে পূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ (অবশ্যই প্রথমে আদি বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ) এই বাহ্যাচারসর্বস্বতাকে অপ্রয়োজনীয় ও ব্রাহ্মধর্মের পরিপন্থী বলে মনে করেছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাই তার বিভিন্ন সংখ্যায় হিন্দুবিবাহরীতির সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বাহ্যাচার ও পৌত্তলিকতাকে বর্জন করে ও সমাজোপযোগী করে ব্রাহ্মরা হিন্দুবিবাহকে একটা সরল ও সুসংস্কৃত রূপ দিতে চেষ্টা করলেন এবং সেই পরিবর্তিত ও সংস্কৃত বিধি অনুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজে বিবাহাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে লাগল। অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের অবলম্বিত ও প্রচারিত বিবাহপদ্ধতিকে হিন্দুবিবাহবিধি থেকে পৃথক ভাবত না; বরং বলা

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৩৬০), পৃ. ৩৩।

যেতে পারে তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি এক প্রকারের 'প্রগতিশীল' হিন্দুবিবাহপদ্ধতি।— 'যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন, তাঁহারা যেন হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না চাহেন এবং আপনাদের ধর্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত করিতে যত্নশীল না হয়েন"[১] এই প্রচারকেই আমরা হিন্দুসমাজের প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের মনোভাবের দলিল বলে উল্লেখ করিতে পারি। আদি সমাজের হিন্দুচরিত্র এমনই ছিল।

কিন্তু কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের এই হিন্দুবিবাহপদ্ধতিনির্ভরতায় সংশয় প্রকাশ করলেন। অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করে কেশব-দেবেন্দ্রর বিরোধের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এবারে কেশবচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, 'হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্ত্তিতে পারে কিনা? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হয়।' এই ব্যক্তিতালিকার মাথায় 'শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর নাম দেখতে পাই।

কেশবচন্দ্র তৎকালীন Advocate General কাউই সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, যেহেতু ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু বা মুসলমান বিবাহবিধিসম্মত নয়, সুতরাং তা অবৈধ। এই রায়ে আদি সমাজ বিচলিত হননি, কারণ তাঁরা তাঁদের বিবাহপদ্ধতিকে হিন্দুবিবাহরীতি-অনুগ বলেই মনে করতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'সকল ব্যক্তির হিত জন্য বর্ত্তমান সিভিল বিল'-এর মতো একটা বিল আনলেন ব্যবস্থাপক সভার সচিব

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধ, মাঘ, ১৭৯৫ শক।

মেইন সাহেব। এই বিলের একটি ত্রুটি ছিল যে, 'যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্মে জন্মিয়া সেই ধর্ম্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্ম্মের বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহ করে, তাহা হইলেও সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে।'[১] এতে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই তীব্র আপত্তি জানাল। 'তাহারা এই কথা বলিল যে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অমান্য করা কার্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।'[২] এই আপত্তি শুনে পরবর্তী সচিব স্টিফেন সাহেব মত বদলাতে বাধ্য হলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৫ জুলাই ১৮৬৮ তারিখের অপর এক অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহ 'প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে' সিদ্ধ কিনা এ-সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেশববাবুর মত হলো, ১) ব্রাহ্মবিবাহ থেকে নান্দীশ্রাদ্ধ বা কুশণ্ডিকা দুইই পরিত্যক্ত হয়েছে, সুতরাং তা হিন্দুবিবাহসম্মত নয়, এবং ২) ব্রাহ্মবিবাহ অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকার করে। সুতরাং সভাস্থ সকলে প্রস্তাব করেন যে, এ-ব্যাপারে 'গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করা হোক।' দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু এই কমিটির মধ্যে থাকতে রাজি হলেন না। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, 'শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মবিবাহ আদালতে অবৈধ গণ্য হইবার আশঙ্কায় যাহাতে এই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হয় এই প্রকার আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন।'[৩]

১. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ১৩৯।
২. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৮ শক, ৪১০ সংখ্যা।

শুধু তা-ই নয়, কেশবচন্দ্র নিজে সিমলায় গিয়ে স্যার হেনরি সামনার মেইন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফলে মেইনের ধারণা হয় যে, ব্রাহ্মধর্মের কোনো সঠিক সংজ্ঞা নেই। সুতরাং আইনের দিক থেকে ব্রাহ্মদের সমগোত্রীয় যাঁরা তাঁদের প্রয়োজনবোধেও তিনি একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন। এটা civil marriage— ধর্মের স্পর্শ বাঁচিয়ে এর অবস্থান— 'A Bill to legalise marriages between persons not professing the Christian religion and objecting to marry according to the orthodox rites of the existing religions'[১]— অর্থাৎ অখ্রিস্টান অথচ প্রচলিত পদ্ধতিতে আস্থাহীন এমন ব্যক্তিদের বিবাহকে বৈধ করার আইন। এর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংযোগ ঐচ্ছিক ব্যাপারমাত্র। দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মবিবিক্ত আইনের সমর্থক ছিলেন না— 'Babu Devendranath declined to act on such committee, thinking the meeting as not properly representing the committee'[২]। ভারতবর্ষের সবকিছু যেখানে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এই বিলকে ধর্মে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। মেইন বললেন, এটা ধর্মচ্যুতদের আশ্রয়স্থল। কিন্তু এটাকে তো অস্বীকার করা যায় না যে, ব্রাহ্মধর্ম ধর্মহীন নয়, বরং অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক।

কাজেই যখন মেইন সাহেব খসড়াটিকে ব্রাহ্মবিবাহ বিল নামে বিধিভুক্ত করার চেষ্টা করতে গেলেন, 'এমন সময় এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল।'[৩] সেই অলক্ষিত প্রদেশটি হলো আদি ব্রাহ্মসমাজ। কারণ

১. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ. ৬২২-৬৩১।

২. Rajnarain Bose— On the Civil Marriage Bill।

৩. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ১৩৯।

কপালে তাঁরা 'আমি ব্রাহ্ম' এমন 'টিকিট' মারতে রাজি হননি। তা ছাড়া 'হিন্দুশাস্ত্র এবং এদেশীয় প্রথা— বিশেষত নানা হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিচিত্র বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে— সে সমস্তই ব্রাহ্মবিবাহকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে অনুকূল।' কাজেই মেইনের বিল পাস হতে পারল না। তারপর বিলটি দীর্ঘ দু-বছর ধরে নানাভাবে পর্যালোচনা করে উক্ত উদ্দেশে গঠিত পর্যালোচনা কমিটি রায় দিল যে, এ-বিল পাস করা যেতে পারে না।[১]

এতেই কিন্তু উদ্যোগী মহল অবসর গ্রহণ করলেন না। সে-কারণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের জন্য 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট' বিল তৈরির উদ্যোগ দেখা দিল। এতে তিনটি মুখ্য শর্ত নিবিষ্ট থাকবে— এক. বিবাহের জন্য ন্যূনপক্ষে তিনজন সাক্ষী থাকবেন। তাঁরা পাত্র-পাত্রী বর্তমানে বিবাহিত নন এমন কথা বলবেন, যদিও পাত্র-পাত্রী বিপত্নীক বা বিধবা হতে পারেন। দুই. পাত্রের বয়স অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর, এবং তিন. পাত্রীকে চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করতে হবে।

এইরকম একটা বোঝাপড়া নিয়ে বিল প্রস্তুত হতে লাগল। ৩১ মার্চ তারিখে বিলটি পাস হবার প্রায় ঠিক অব্যবহিত পূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ দুই সহস্র ব্রাহ্মের[২] স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র[৩] সরকারের কাছে পেশ করলেন। বলা বাহুল্য, এই বিল সম্পর্কে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রতি ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি মোটামুটি চারটি বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল:

---

১. ইতিমধ্যে শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ সংশয়বাদীরা নিরীশ্বর বিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

২. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনেকের ধারণা, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বহুজনই পৌত্তলিক ছিলেন।

৩. আবেদনপত্রটির লেখক ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাজনারায়ণ বসু, দ্রষ্টব্য The Civil Marriage Bill, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

প্রথমত, এই বিল সকল ব্রাহ্মদের গোচরে আনা হয়নি। তা ছাড়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হননি এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মসমাজ কখনওই হিন্দুসমাজবহির্ভূত নয়; এ-বিল পাস হলে সকলে ব্রাহ্মদের হিন্দুসমাজ থেকে অন্য কিছু একটা ভেবে বসবে।

দ্বিতীয়ত, এই বিল সামাজিক প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করছে, সেটা করলে ভারতীয়রা যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ হবে। রেজেস্টারি বিবাহ একটি চুক্তির অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং সাধারণভাবে এ-দেশে মেয়েদের বিয়ে চৌদ্দ পেরোবার আগেই সম্পন্ন হয়ে যায় ('That the marraigeable age of native girls in India is considered to be below fourteen years.')।

তৃতীয়ত, মেইন সাহেবের যা-ই ধারণা হোক না কেন, ব্রাহ্মগণের একটা সংজ্ঞা আছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 'যাহারা এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করে তাহারাই ব্রাহ্ম।' তবে যে-দেশীয় সমাজের তাঁরা অন্তর্ভুক্ত, সে-সমাজের আচারানুষ্ঠান পরিত্যাগ করতেই হবে, এমন কোনো নিষেধসংকেতও নেই। কেবল পৌত্তলিক অংশটুকু আবশ্যিকভাবে বর্জনীয়।

চতুর্থত, অসবর্ণ বিবাহের পর জাত সন্তান তার মাতাপিতার সম্পত্তির অধিকার কোন আইনবলে পাবে, বিলে তার উল্লেখ নেই (অথচ কেশবচন্দ্র এই ব্যাপারেই অধিক জোর দিতে চেয়েছিলেন)।

আদি ব্রাহ্মসমাজের এই প্রতিবাদ সম্পর্কে 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ রচয়িতা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় দুটি অভিযোগ এনেছিলেন। আমাদের

মতে, সে-অভিযোগ দুটি অযৌক্তিক। তাঁর মতে, রাজনারায়ণ বসু নাকি বলেছেন যে, 'বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহারো পত্নী চিররোগ বা বন্ধ্যাত্বাদি দোষযুক্ত হইলে অপর নারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না।' রাজনারায়ণের সুরসিক বলে খ্যাতি ছিল। তথাপি এমন হাস্যকর মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে রসিকতার খাতিরেও সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় অভিযোগ, বসুজা নাকি লিখেছেন, পাত্রীর বিবাহের বয়স 'চতুর্দশ বর্ষ নহে দ্বাদশ বর্ষ'। এটিকে আমরা রাজনারায়ণের 'That the marraigeable age. . . below fourteen years.'-এর দুর্বল অনুবাদ বলে মন্তব্য করতে চাই।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের বলে নেওয়া ভালো যে, কেশবচন্দ্র ডা. চার্লস গ্রান্ট প্রমুখ দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা চিকিৎসকদের কাছে অনুসন্ধান করে এ-দেশের মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্পর্কে নানা মত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নানা দিক বিচার করে বিভিন্নজনে চৌদ্দ থেকে একুশ বছরের সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। সে-দিক থেকে রাজনারায়ণ বসুর 'considered below fourteen years'— এই মত চিকিৎসকদের মতের পরিপন্থী।

মোটকথা এবারেও এই বিল পাস হতে পারল না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে বাগবিতণ্ডার ঝড় উঠল। আদি ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপ, কাশী, ত্রিবেণী, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মত এনে ব্যবস্থাপত্র রচনা করে বললেন যে, তাঁদের অনুসৃত বিবাহপদ্ধতি অবশ্যই বৈধ— সুতরাং আইন পাস করার প্রয়োজন নেই। আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই মতকে একটা প্রচণ্ড ফাঁকি বলে প্রচার করতে লাগলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিবাহ সম্পর্কে এই যে বিবাদ— তা আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল অথবা আরও

খোলাখুলিভাবে হিন্দুসমাজ ও তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমিত ছিল। এবং এ-ব্যাপারে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটি এতখানি সরল জলবৎ ছিল না। এ-কথা আমরা জেনেছি যে, ইংরেজ সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথা বা ধর্মীয় ব্যাপারে খুব একটা হস্তক্ষেপ করতে চাইত না (বলা বাহুল্য, মিশনারিদের কথা স্বতন্ত্র) কোনোদিন। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশ সরকার যে ভারতীয় সামাজিক ঐক্যের মধ্যে নানাভাবে ফাটল ধরাতে আলস্যপ্রকাশ করত, এমন নয়। অন্তত ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের 'তিন আইন'-এ ইংরেজের এই চতুর চরিত্র অপ্রকাশ থাকেনি।[১]

ভারতে প্রচলিত জাতিভেদপ্রথা ব্রিটিশ সরকারের কাছে শাপে বর ছিল। কারণ এর জন্য ভারতীয়রা এখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, অন্তত সামাজিক ক্ষেত্রে। এই সুযোগ নিতে ব্রিটিশ সরকারের কার্পণ্য ঘটেনি। কিন্তু যখনই কেশবচন্দ্র প্রমুখর উদ্যোগে জাতিভেদপ্রথার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনই ইংরেজ সরকার মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। তাই আদি ও ভারতবর্ষীয়— উভয় সমাজের বিরোধকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত বিলের সঙ্গে একটা ফ্যাকড়া জুড়ে দিলেন এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের 'তিন আইন' (Act III of 1872) নামে বিলটি পাস হয়ে গেল। ফ্যাকড়াটা— ব্রাহ্মরা হিন্দু নন, এমন একটা বিভেদমূলক কথা। কেশবচন্দ্র নিজে 'হিন্দু নন' (অর্থাৎ ব্রাহ্মরা হিন্দু নন) এ-কথা ঘোষণা করে বিবাদকে আরও ঘোরতর করে তুললেন। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও হিন্দুমেলাখ্যাত নবগোপাল মিত্রকে কেশববাবু বললেন যে, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি।'[২] এ-কথা শোনা মাত্রই 'সেদিন দুই ভাই-এ ছাড়াছাড়ি

১. শ্রীযোগানন্দ দাসের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য— Studies in Bengal Renaissance, Ed. Atul Gupta.
২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ২৪০।

হইল।' আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মাত্র এই একটি মনস্তত্ত্বেই ('আমি হিন্দু নই'—'The term Hindu does not include Brahmos') সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল; রামমোহন ও মহর্ষি থেকে দূরে চলে এসে ব্রাহ্মধর্ম একটা পৃথক (separate) ধর্মরূপে পরিগণিত হয়ে গেল। [লক্ষ করার বিষয়, এই বিবাদের পরই 'চৈত্রমেলা' 'হিন্দুমেলা' নামে আখ্যাত হতে থাকে]। বাদ-প্রতিবাদ তুঙ্গে উঠল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (পৌষ ১৭৯৮ শক) এই বিবাহকে 'বাটী কিংবা ভূমি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রারের সম্মুখে যেমন রেজিস্টারি করিতে হয়' সেই প্রকার স্বামী-স্ত্রীর রেজিস্টারি বলে বর্ণনা করেছে এবং এটা যে নিরীশ্বর বিবাহের একমাত্রা অধিক নয়, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।

অবশ্য এজন্য নিরীশ্বর বিবাহের পক্ষপাতীরা পরে এই বিধির সঙ্গে ঈশ্বর-উপাসনা যুক্ত করে নিয়েছে। তত্ত্ববোধিনী আরও সাবধান করে দিয়েছে 'পতিপত্নীর অকাট্য চির-সম্বন্ধ নিরাকৃত' হবে— ডাইভোর্স উভয় তরফ থেকেই অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু তীব্রতর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর দুটি প্রতিবাদ রচনা আদি সমাজের বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরল। প্রথম প্রতিবাদটি কেশবচন্দ্রের 'আমি হিন্দু নই' ঘোষণার বিরুদ্ধে 'হ্যাঁ হিন্দু' আন্দোলনকেন্দ্রিক। আমরা জানি রাজনারায়ণ বসু এই তুমুল আন্দোলনের প্রাক্কালে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক এক বিখ্যাত তৎকালোচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। যে-সভায় এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়, সে-সভার সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই বক্তৃতা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী যে-কথা লিখেছেন, তা থেকে তৎকালীন হিন্দুসমাজে বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বুঝতে পারি। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন:

> ঐ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তি সংগত ও জাতীয় ভাব পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'সোমপ্রকাশে' লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন; সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণবাবুকে হিন্দুকুলশিরোমণি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, সুদূর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল; এবং ইংলণ্ডে টাইমস্ পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল। রাজনারায়ণবাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন।

শুধু তা-ই নয়, পণ্ডিত ম্যাক্সম্যুলর তাঁর 'Introduction to the Science of Religion' গ্রন্থে এই বক্তৃতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। রুটলেজ সাহেবও বক্তৃতাটি সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্যের পরিশেষে লিখেছেন, 'Babu Rajnarain Bose has a right to his views, and we admire his manliness.'[১]

প্রতিবাদের প্রতিবাদ হয়নি এমন নয়। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটি ও এলাহাবাদে একটি বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন।'[২]

শিবনাথ শাস্ত্রী এ-সম্পর্কে নিজেও বলেছেন, 'কেশববাবুর পক্ষ হইয়া আমরা কয়েকজন তদুত্তরে বক্তৃতা করিলাম, সে কথা কাহারও কর্ণে পৌঁছিল

---

১. রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত'-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৫৮।

২. তদেব, পৃ. ৫৬।

না, বরং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।' শিবনাথ আরও স্বীকার করেছেন, 'চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।'

এই উদ্দেশ্যই ইংরেজ সরকারের ছিল। অবশ্য সে-কথা তখন রাজনারায়ণ বসুও বুঝে উঠতে পারেননি। তা তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবাদটি থেকে জানতে পারি।

নূতন আইন সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর অভিমত ছাপিয়ে 'An Appeal to the Brahmos of India' নামে এক উদ্দীপনপত্র কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মমন্দিরের সম্মুখে প্রচারিত হয়েছিল। এই পত্রে বসু মহাশয় উল্লেখ করেছেন, "There is another point to be taken into consideration in connection with the bill and that is the most important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this? Not Government but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord."[১] নিজদোষ দর্শন করলেও রাজনারায়ণ এর একটা অন্যতর বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন— তিনি আরও লিখেছেন, 'If Government take away this privilege from our hands, we shall be obliged at every step in future to solicit government interference in our religous and social concerns.'[২] রাজনারায়ণের আশঙ্কা তাঁর দূরদর্শিতার প্রত্যক্ষ ফল।

১. এবং ২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ১৪২-৪৩।

যাই হোক, সুচতুর সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টার মূলে তারা কুঠারাঘাত করল। সরকারের এই বিভেদনীতিকে আমরা আরও একবার সুযোগ নিতে দেখব ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের কুচবিহার-বিবাহ আন্দোলনে।

বিবাদবিসংবাদ উচ্চরোলে চলতে থাকল, কিন্তু আইনের কোনো পরিবর্তন হলো না। সগৌরবে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের 'তিন আইন' বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। অবশ্য, এই বিধি প্রবর্তন যে সামাজিক বিপ্লবের একটা নমুনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। কেশবচন্দ্র নিজে এই আইনকে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার চরম প্রতিষেধক বলেই ভাবতেন। আইন পাসের আগেই কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ কলকাতা টাউন হলে এই বিবাহসংস্কারের সমর্থনে যথার্থই বলেছিলেন— 'The Brahmo Marriage Bill contemplates a more comprehensive reformation than is possible for the present generation of educated Natives to imagine or conceive. It seeks to overthrow caste and not mere idolatry. It contemplates inter-marriages between the Sikhs and Bengalees, the inhabitants of Bombay and Madras, between the Tamil and Telegu races in Southern India and the people of North Western Provinces. The Bill contemplates a union and fusion of the many discordant social elements which lie scattered in the amplitude of the Indian Continent— and which, when gathered and blended into one harmonious unity, will be called by no other name in future than the reformed Indian Brotherhood.'[১] ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতির প্রথম রচয়িতা হলেও এই

১. Keshub Chunder Sen, National Marriage Reform, 2nd Ed., Calcutta, 1951, pp. 12-13.

আইনের দ্বারা কেশবচন্দ্রের আশা বহুলাংশে পূরণ হয়েছিল, এমন বলা অসংগত হবে না।

কিন্তু ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কুচবিহার-বিবাহ পর্যায়ে এই আইনের দায়িত্ব স্বয়ং কেশবচন্দ্রকে কতখানি বইতে হয়েছিল, তা লক্ষ করব। প্রসঙ্গটি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি।

কুচবিহার-বিবাহ প্রসঙ্গ

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে একটি বিশেষ বিবাহবিধি 'তিন আইন' নামে বিধিবদ্ধ হয়। এই বিলে অসবর্ণ বিবাহ আইনের স্বীকৃতি পায় এবং পাত্র-পাত্রীর বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ ও ১৪ বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দিষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই আইন পাসের ব্যাপারে সর্বাধিক সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিই পরে এই আইনের শিকার হয়ে পড়েন। তাঁর অনুগামীরা মতপার্থক্যের কারণে তাঁর বিরোধিতায় সর্বশক্তি ব্যয় করতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্রও এই বিবাহের পর প্রত্যক্ষ সামাজিক সংস্কারের পরিবর্তে পারমার্থিক সাধনায় নিরাবিল ও কোলাহলবিহীন শান্তিসমাধিতে আবিষ্ট হলেন। বর্তমান অংশে এই আলোড়নের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করছি।

উগ্র স্বাধীনতাবোধ, বিশ্বশাস্ত্রে গভীর আস্থা, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা এবং তীব্র আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্য কেশবচন্দ্রকে বেশিদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেয়নি। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ যে কেশবচন্দ্রকে হৃদয়ের বড়ো কাছে পেয়ে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সেই কেশবচন্দ্রই মহর্ষির কাছে 'পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পরামর্শ' প্রার্থনা করে পত্র দিয়েছিলেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে পৃথক সমাজ স্থাপন করলেন।

যখনই কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে তখনই দল গঠনের একটা সুপ্ত ইচ্ছা মনের মধ্যে সক্রিয় হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দল গঠনের একটা ইচ্ছা গুপ্তভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এমন মন্তব্যে আশা করি আপত্তি উঠবে না। স্বাভাবিকভাবেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর থেকেই (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে) একদল লোক তাঁর অনুগামী হয়ে পড়েছিলেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত সমাজে তাঁরা কেশবচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু এই অনুগামী দলও একসময়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একাংশ তাঁকে আমরণ সমর্থন করে গেছেন এবং অপরাংশের সঙ্গে তাঁর মতান্তর-মনান্তর ঘটে। অর্থাৎ পৃথক সমাজ সংস্থাপন করলেও নানা কারণে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের পুনর্বিচ্ছেদকে রোধ করতে পারেননি।

২

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সমাজভুক্ত কতিপয় ব্যক্তির মতবিরোধের কারণ বিভিন্ন সময়ে উগ্র হয়ে দেখা দেয়। আমরা সেগুলির কোনো-কোনোটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে চাইছি। কারণ শুধুমাত্র কন্যার বিবাহের কারণেই কেশবচন্দ্র স্বসমাজে তিরস্কৃত হননি।

এক।। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য— যেমন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর এবং আরও অনেকে— কেশবচন্দ্রের কাছে জানালেন যে তাঁরা উপাসনাকালে মন্দিরে পর্দার বাইরে আপন আপন পরিবারস্থ মহিলাগণকে প্রকাশ্যে বসাতে চান। স্ত্রীলোকেরা কয়েক বার উপাসনামন্দিরে এভাবে প্রকাশ্যে

বসতে থাকলে সমাজভুক্ত কেউ কেউ এতে আপত্তি প্রকাশ করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে (পৃ. ১৪৮) লিখেছেন, মন্দিরের দারোয়ানরা নাকি এ-কারণে মহিলাদের অসম্মান পর্যন্ত করে। ফলে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতীগণ ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বউবাজারের বাড়িতে পৃথক উপাসনা সমাজ স্থাপন করেন। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার এই পৃথক উপাসনায় যোগ দেন। রাজনারায়ণ বসুও দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে দিন কতক এই নূতন সমাজের আচার্যর কাজ করেন। আত্মচরিতে রাজনারায়ণ লিখেছেন, 'নূতন সমাজে আমার অব্যবহিত সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন, তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন।. . . স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। এই সমাজ ৬।৭ মাসের পর উঠিয়া গেল।' কেশবচন্দ্র সময়ের গতি বুঝে বিষয়টি মিটিয়ে নিলে স্বতন্ত্র সমাজ উঠে যায়। মনে রাখতে হবে এই কেশবচন্দ্রই ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মাঘোৎসবের সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য উপাসনামন্দিরে উপবেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

দুই॥ কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে শিক্ষাদান বিষয়েও এই অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের দীর্ঘস্থায়ী মতপার্থক্য স্থাপিত হয়। এর ফলে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বালিগঞ্জের একটি ভাড়াবাড়িতে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিলাত-প্রত্যাগত কুমারী এক্রয়েড এই বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিদ্যালয়ই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে

পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

তিন॥ ব্রাহ্মসমাজকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার একটা আকাঙ্ক্ষা এই অত্যগ্রসর দলের সভ্যগণের মনে সঞ্জীবিত ছিল। কেশবচন্দ্র এ-বিষয়ে বিলম্ব করছেন দেখে একদল ব্রাহ্ম তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলেন। এই কালের মধ্যে আনন্দমোহন বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতের প্রথম র‍্যাংলার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে একটি নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করলেন। প্রাথমিক বিরোধিতা সত্ত্বেও এই কারণে এলবার্ট হলে একটি প্রতিনিধি সভা আহূত হলো। প্রতিনিধি সভায় সম্পাদক হলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র এবং সহ-সম্পাদক হলেন আনন্দমোহন বসু। অবশ্য সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণের একাংশের অসহযোগিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সভাটি 'বিযুক্ত' হয়। এতে ব্রাহ্মদের অপরাংশের মনে অসন্তোষ ধূমায়মান হতে থাকে।

চার॥ এই অসন্তোষ অগ্নিরূপ ধারণ করল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত আশ্রমে সংঘটিত একটি অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এতে কেশবচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে কতখানি জড়িত ছিলেন তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। তবে এর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। এ-সময়ে মজিলপুরের হরনাথ বসু সপরিবারে ভারত আশ্রমে বাস করতেন। অমিতব্যয়িতার কারণে এই দিলখোলা মানুষটি আশ্রমের নিকট ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আশ্রম পরিত্যাগের পূর্বে ঋণশোধ না করে চলে যেতে চাইলে তাঁর গাড়ি ভৃত্যেরা অবরোধ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ত্রীর গায়ের গহনা খুলে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে

হয়। দারুণ সমালোচনার মধ্যে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'সমদর্শী' নামে একটি দল প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচারের অন্ত রইল না। আদালত পর্যন্ত এই ব্যাপার গড়িয়ে গেল। বিরুদ্ধ বক্তৃতায় কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমির কক্ষ পরিপূরিত হয়ে উঠল। 'সমদর্শী' পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘটল। নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন দৃঢ়ীকৃত হতে থাকল।

পাঁচ॥ একসময়ে কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে ভক্তদের দ্বাবা প্রেরিত ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হয়েছিলেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আন্দোলন ওঠে। এই অত্যগ্রসর দলের কেউ কেউ, যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী, তখনও পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন।

মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে প্রধানত অত্যুগ্র স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা কেশবচন্দ্রকে তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কেশবচন্দ্র যে কম স্বাধীনচেতা ছিলেন এ-কথা বলার স্পর্ধা কারও নেই। কিন্তু তাঁর বিরোধীদল স্বাধীনতা আনয়নের ক্ষেত্রে কালক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া মহৎকে ঈর্ষা করার যে-জাতীয় গুণে আমরা অদ্যাবধি ভূষিত, সেই ঈর্ষাও কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকে সুনজর দিতে পারেনি।

সংক্ষেপে আমরা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের মুঙ্গের নরপূজার আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'সমদর্শী' পত্রিকার প্রকাশ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে-অসন্তোষ তাঁর সমাজের এক শ্রেণির সভ্যের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছিল তার একটা পরিচয় পেলাম। এ-কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই কালের মধ্যে

১৮৭২ সালের ‘তিন আইন’ নামক বিবাহবিধি আইনসিদ্ধ হয়েছে। এবং এই বিষয়ে অন্তত এই কেশববিরোধী গোষ্ঠীই ব্রহ্মানন্দকে সান্তর সমর্থন জানিয়ে এসেছে। এ থেকে বিরোধীপক্ষের স্বাধীনতাস্পৃহা, সংস্কারমুখী চিন্তা এবং কেশবচন্দ্রের কোনো কোনো সংস্কারমূলক কার্যের প্রতি তাঁদের অসাম্প্রদায়িক সমর্থনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

৩

প্রবচন আছে লোহা ভাঙলে আবার জোড়া দেওয়া যায় কিন্তু মন ভাঙলে যায় না। বিশেষত সেই মন যদি আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন হয়। কাজেই এই ‘সমদর্শী’ দলের মুখপত্র ‘সমদর্শী’র প্রচার একসময়ে রহিত হলেও এই দলের বৈশিষ্ট্য লোপ পেল না। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁদের মন বিরুদ্ধভাবাপন্নই থেকে গেল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মতান্তরের পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থেকেই উভয়পক্ষের এতদিন তাল ঠোকাঠুকি চলছিল। এবারে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হবার মতো ক্ষেত্র পেয়ে গেলেন। ঘটনা বলতে, বলা বাহুল্য, বিবাহের ঘটনাকেই বোঝাচ্ছি। এবারে তার কথাই বলছি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কুচবিহার ছিল একটি সামন্তরাজ্য। এই রাজবংশের চতুর্থ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর পুত্র মহীনারায়ণকে সেনাপতির পদে বৃত করেন। রাজসিংহাসনের লোভে পরবর্তী কয়েকজন রাজার ও দাবিদারের সঙ্গে মহীনারায়ণ ও তাঁর বংশধরদের বিরোধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মহীনারায়ণের বংশধররাই রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই বিবাদের সময় মোগলেরা কুচবিহারের একাংশ দখল করে নিলে কুচবিহাররাজ ভুটানরাজের সাহায্য গ্রহণ

করেন। অচিরকাল মধ্যে ভুটানরাজ কুচবিহারে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এবং এই ভুটিয়াদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে না পেরে কুচবিহাররাজ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কুচবিহার ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে। কাজেই ব্রিটিশ সরকার কুচবিহার রাজ্যের এজেন্টস্বরূপ ছিল। ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে কুচবিহারের সিংহাসনপ্রাপ্ত হন নাবালক রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। তাঁর এ-দেশের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে বিদেশে পাঠানোর জন্য ইংরেজ সরকার আয়োজন করছিলেন। তৎপূর্বে বিবাহ প্রদানের জন্য রাজপরিবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ফলে উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এই রাজপরিবার জাতিতে হিন্দু হলেও অসবর্ণ বিবাহে এঁদের কোনো আপত্তি ছিল না; কাজেই পাত্রী অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত ছিল। এজন্য কলকাতায় দূত প্রেরিত হলো। শিক্ষিত পাত্রের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিতা কন্যার। দুর্গামোহন দাসের কন্যা, ভুবনমোহন দাসের কন্যা এবং অন্যত্র বহু অনুসন্ধানের পর কেশবচন্দ্র-জগন্মোহিনীর দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম কন্যা সুনীতি দেবীকে মনোনীত করা হয়। কেশবচন্দ্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিবেদন করা হলো। তিনি কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বিবাহে সম্মতি প্রদান করলেন। বিবাহের কথাবার্তা অগ্রসর হতে থাকল।

কেশবচন্দ্র তাঁর স্বনির্বাচিত পাত্রে কন্যার সামাজিক বিবাহ দেবেন। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আপত্তি উঠল চারদিক থেকে। এতদিন ধরে যাঁরা কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা করে এসেছেন ব্যক্তিগত কারণে নয় গোষ্ঠীগত কারণে, তাঁরা এ-ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারেন না। এ-কথা তাঁরা কীভাবে মেনে নেবেন যে কেশবচন্দ্রের মতো সর্বজনপূজ্য নীতিস্থাপক সমাজনেতা কীভাবে নীতিবিসর্জন দিয়ে হিন্দুরাজপরিবারের পুতুলপুজোকে

মেনে নিতে চলেছেন? ব্রাহ্মসমাজই বা কীভাবে এমন নেতার নেতৃত্বে তার উচ্চ আদর্শ সগৌরবে ঘোষণা করবে? কন্যাচাক্ষুষের কথা, পাত্রী নির্বাচনের কথা নিয়ে সাধারণে কানাকানি করতে লাগল। কেশবচন্দ্র নিজে কাউকে কোনো কথা বলেননি। অথচ শোনা যাচ্ছে নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদ, নিশ্চিতরূপে এই বিবাহ অতিশীঘ্র সংঘটিত হতে চলেছে। এবং এই বিবাহ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ বিবাহবিধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই আইনে দুটি প্রধান প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছিল। এ-দেশের বিবাহে পাত্র-কন্যার ন্যূনপক্ষে বয়স কত হবে এবং এই বিবাহ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে কিনা। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ-দেশের চিকিৎসকগণের মতামত প্রার্থনা করা হয়েছিল। অধিকাংশই মত দিয়েছিলেন কন্যার বয়স সর্বনিম্ন হবে ষোলো বছর। কিন্তু ডা. চার্লস প্রভৃতি কয়েকজন চিকিৎসক কন্যার এই বয়সকে চৌদ্দ বলে ঘোষণা করেন। পাত্রের বয়স নির্দিষ্ট হয় নিম্নপক্ষে আঠারো। আইনে শেষোক্ত বয়স দুটি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়, আমি হিন্দু নই বা কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নই— এ-কথা ঘোষণার দ্বারা। এ-কথা ঘোষণা করবেন পাত্র-পাত্রী স্বয়ং।

এখনও বিবাহ হয়নি। সুতরাং হিন্দুরাজপরিবার শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ছাপ বজায় রাখবেন কিনা জানা যাচ্ছে না। তবে বয়সটা একটা বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে যদি বিবাহ হয় তবে পাত্র-পাত্রী কেউই বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হবেন না— দুজনেই বিধিমতে অপ্রাপ্তবয়স্ক। বিশেষত 'বড় পুঁটির বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না।' 'বড় পুঁটি' সুনীতি দেবীর আটপৌরে নাম। আইন পাস করিয়েছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন এবং তিনিই এখন আপন কন্যার বিবাহে আইন লঙ্ঘন করতে চলেছেন! নিয়মতান্ত্রিকের দল, সমদর্শীর দল, স্ত্রীস্বাধীনতার দল,

আদি ব্রাহ্মসমাজ আইন অমান্যকে কি সহজভাবে নিতে পারেন? সুতরাং বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা চলতে লাগল। মনে মনে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন— এ-বিবাহ সংঘটিত হতে দেওয়া হবে না। শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কর্তব্য স্থির করার জন্য ঘন ঘন মিলিত হতে লাগলেন। এমনকী বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব পর্যন্ত ধিক্কারধ্বনি দিতে দিতে এই অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। এঁরা মোটামুটি নিম্ন-প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করলেন:

> কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে বিবাহের ঘটক হিসাবে কলকাতায় এসেছেন যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি কুচবিহারের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্তমানে অভিভাবক ব্রিটিশ সরকারের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত। ইনি শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বপরিচিতও বটে। কাশীর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় তখন কলকাতায় বাস করছিলেন। যাদব চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে এসে উঠেছেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল বিবাহের কথাবার্তা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। বিবাহের শর্তাদি নিরূপণের জন্য রাজপুরোহিত এসেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যাচাক্ষুষের পর্বও সমাপ্ত। কেশবচন্দ্র কলুটোলার নিজের বাড়ির একাংশ বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে মিস পিগটের স্কুলের বাড়ি কিনে বাস করছেন। বাড়িটার সংস্কার করিয়ে নাম দিয়েছেন 'কমল কুটির'; এই কমল কুটিরেই কন্যাচাক্ষুষপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
>
> রাজপুরোহিতের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র এই বিবাহে কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলেন। এই শর্তগুলি থেকে মনে হয় কেশবচন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে আইন লঙ্ঘন করতে চাননি।

এক দুর্বার ষড়যন্ত্রের তিনি যেন অসহায় বলি হয়ে উঠেছিলেন। শর্তগুলি যথাক্রমে এই প্রকার ছিল— 'প্রথম শর্ত ছিল যে, ঐ বিবাহ তখন বাগদান-স্বরূপ হইবে এবং দুই বৎসর পরে পরিপূরক বিবাহানুষ্ঠান হইলে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্র সংসারে প্রবেশ করিবেন। দ্বিতীয় শর্ত ছিল যে, পাত্র একেশ্বরে বিশ্বাসী (Theist) হইবেন এবং এক ভিন্ন দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিবেন না। তৃতীয় শর্ত ছিল যে, বিবাহ-সভায় দেব-দেবীর বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা বা অগ্নি থাকিবে না; বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে, অব্রাহ্মণ আচার্য্য পৌরোহিত্য করিবেন এবং দেব-দেবীসূচক শব্দ পরিহার করিয়া বিবাহানুষ্ঠান হইবে।' দীর্ঘ আলোচনান্তে রাজপুরোহিত, রাজমাতা এবং ব্রিটিশ সরকার সম্মত হলেন।

আরও শোনা গেল কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় স্বগৃহেই জাতিচ্যুত হয়েছিলেন; কাজেই তিনি কন্যাসম্প্রদান করবেন না। এ-কাজ করবেন কন্যার পিতৃব্য কৃষ্ণবিহারী সেন। হিন্দুরাজপরিবারই সর্বত্র প্রাধান্য স্থাপন করতে চলেছে। বিবাহ দেবেন সম্ভবত রাজপুরোহিত স্বয়ং। কেশবচন্দ্র কলুটোলার অতিঅভিজাত সেনপরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মহারাজা তো নন। ব্রিটিশ সরকার তো তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করে না। তদুপরি সাধারণ রীতি অনুসারে পাত্র বিবাহের জন্য কলকাতা আসবেন না। কেশবচন্দ্র কন্যাকে বহন করে নিয়ে যাবেন কুচবিহারে। একটু ছোটো তাঁকে না হলে কী চলে? রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রবল বিরোধিতা এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজের বিপক্ষতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করছিল দেবেন্দ্র-কেশবের ব্যক্তিত্বময় নেতৃত্বের ছত্রছায়ায়। কিন্তু এই বিবাহসংবাদে ব্রাহ্মসমাজে

আভ্যন্তরীণ বন্ধন যেন শিথিল হয়ে পড়ছিল। একে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য কেশববিরোধী গোষ্ঠী প্রতিবাদের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁদের মতে 'আইনটি পরিত্যাগ করা কেশববাবুর পক্ষে কোনক্রমেই কর্তব্যবোধ হয় না। তাহলে আর কাহাকেও সে পথে প্রেরণ করা দুষ্কর হইবে।'

জনশ্রুতির উপর তাঁরা আর আস্থা স্থাপন না করে কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। যাদববাবু এসেছিলেন ১৮৭৮-এর জানুয়ারির প্রারম্ভে; কথাবার্তায় জানুয়ারি গত হলো। ফেব্রুয়ারি মাসের দু-তারিখে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। যাবার পথে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে তাঁদের দেখা। সবে তিনি তখন বোম্বাই থেকে ফিরেছেন। বিবাহের সকল কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি জানালেন, তিনি প্রবাসে ছিলেন, ঘটনার সবিস্তার পরিচয় তাঁর জানা নেই। কেশবচন্দ্রের কাছে যাবার পরামর্শ দিলেন তিনি। তখন তাঁরা কেশবচন্দ্রের কাছে এলেন। কেশবচন্দ্র সব শুনলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনো কথা বললেন না। শুধু জানালেন, 'এখন কন্ডিশন লইয়া কথাবার্তা চলিতেছে। কিছু স্থির হয় নাই।' এবং অধিক চাপাচাপি করলে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অগত্যা তাঁরা হতাশ মনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রায়ই সভা বসতে লাগল। জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হলো। গুরুচরণ মহলানবীশ, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু— নানা সময়ে নানা মত প্রকাশ করতে লাগলেন। অবশেষে ৫ ফেব্রুয়ারি কেশববাবুর আচরণের প্রতিবাদে সকলে সম্মত হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর প্রতিবাদপত্র রচনার ভার অর্পিত হলো। ৬ ফেব্রুয়ারি শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, কালীনাথ দত্ত, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চৌধুরী এবং কামাখ্যাচরণ ঘোষ ৯৩ নং কলেজ স্ট্রিটে উপস্থিত হলেন। গভীর রাত্রি। বছর দেড়েক আগে এখানে ভারত সভা স্থাপিত হয়েছে। অনেক বাগবিতণ্ডা চলতে লাগল। প্রতিবাদপত্রে দুর্গামোহন দাস এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে স্বাক্ষরদানে অসম্মতি জানালেন। পরে অবশ্য তাঁরা স্বাক্ষর করেন। সর্বমোট তেইশজন ব্যক্তি এই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রতিবাদপত্রটি কেশবচন্দ্রকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত ও বিভিন্ন সমাজের মতামতের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। সহজলভ্য নয় ভেবে দীর্ঘ পত্রটি এখানে তুলে দিচ্ছি। এ-থেকে মূল অভিযোগটিও আমরা জানতে পারছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু কেশবচন্দ্র সেন
মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়।
আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, কুচবিহার রাজার সহিত ত্বরায় আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সাধারণতঃ পুত্র-কন্যার বিবাহ পিতামাতারই বিবেচ্য বিষয় এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই যে, আপনার কার্য্যের উপর আমাদের সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের শুভাশুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের মৌনী থাকা কর্ত্তব্যবোধ হইতেছে না। আমরা নিতান্ত বিষণ্ণ ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধ চিত্তে আপনাকে কতিপয় অভিপ্রায় জানাইতেছি, আশা করি আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইবার পূর্ব্বে সেগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। এই বিবাহে আমাদের কতকগুলি আপত্তি আছে।

প্রথমত— আমরা বাল্যবিবাহকে পাপ মনে করি, প্রকৃত বিচার করিলে, কন্যার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং পতিমর্য্যাদাবোধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্যবোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনি নিজে যখন এ বিষয়ে প্রধান চিকিৎসকের মত জিজ্ঞাসা করেন তখন তাঁহাদের অনেকে অষ্টাদশ বা ততোধিক বর্ষকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশকাল বোধে ১৮৭২ সালের এ আইনে ন্যূনকল্পে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষকে কন্যার পক্ষে বিবাহকাল বলিয়া নিয়ম করা হয়। আপনি সে সময়ে এই নিয়মটি সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, এবং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে আপনি রাজবিধি-নিরূপিত ন্যূনকল্প বয়সের মুখাপেক্ষা না করিয়া বরং তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজে সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আপনার কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষও পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন।

দ্বিতীয়ত— আপনারই পরামর্শানুসারে উক্ত আইনে পুরুষের পক্ষে ন্যূনকল্পে পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষকে বিবাহকাল বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাকেও এক প্রকার বাল্যবিবাহ বলা উচিত। কিন্তু যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে আপনি উক্ত রাজার ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ না হইতে হইতেই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। যদি এরূপ বলা হয় যে বিবাহের পর দম্পতি কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন

থাকিবেন, এ প্রকার কোন নিয়মপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বাল্যবিবাহজনিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আদি সমাজ সংশ্লিষ্ট কোন ব্রাহ্মকন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথা বলায় তৎকালে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' তাহার উত্তরে যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে।

তৃতীয়ত— আপনি এতদিন উপদেশ ও প্রকাশ্য পত্রে বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছেন তদনুসারে যাহাদের অদ্যাপি বিবাহের দায়িত্ববোধের শক্তি জন্মে নাই তাহাদের বিবাহকে বিবাহই বলা যায় না অথচ আপনি এক শিশুর হস্তে আর এক শিশু অর্পণ করিতেছেন।

চতুর্থত— কেবলমাত্র উপাসনাপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বৈধ হয় কিনা এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোরতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়া একটি রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া লন। তদবধি অনেক স্ত্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি অনুসারে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। উক্ত রাজবিধির কোন কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরূপ স্থলে কোথায় আপনি উক্ত রাজবিধিতে লোকের রুচি জন্মে তাহার চেষ্টা করিবেন, না, আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্যেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন আপনার দৃষ্টান্তে অনেক ব্রাহ্ম পাত্রের পদসম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য প্রলুব্ধ হইয়া উক্ত রাজবিধি অতিক্রম করিবে।

পঞ্চমত— উক্ত রাজবিধি অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু সেই বিধি অতিক্রম করিয়া আপনি যে রাজবংশে কন্যা দিতেছেন, বহুবিবাহ তাঁহাদের বংশে কৌলিক প্রথা। বর্তমান রাজা ইংরাজদিগের দ্বারা শিক্ষিত। ঈশ্বর করুন তাঁহার সেরূপ দুর্মতি না হউক কিন্তু রাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তাঁহার চরিত্র আজও সংগঠিত হয় নাই। এরূপ অবস্থাতে এই শিক্ষার ফল অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং, এই বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে আপনি জামাতার ধনে এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, কন্যার দাম্পত্য সুখের ব্যাঘাত হওয়াকেও আশঙ্কার কারণ মনে করেন না। বলা বাহুল্য যে আপনার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ হওয়াও আমাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক।

ষষ্ঠত— আমরা কি অপর কেহ এতদিনে উক্ত রাজাকে কি রাজপরিবারকে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মে উৎসাহী বলিয়া জানি নাই, শুনিও নাই। বরং কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার যে বিবাহের কথা হয় তাহাতে পৌত্তলিক মতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এরূপ স্থলে কিরূপে ব্রহ্মপরায়ণ 'ব্রাহ্ম' বলিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হইবে? আর আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি আপনার কন্যার সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে রাজা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতেন কিনা? যদি তাহা না হইত, এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে এখন ব্রাহ্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া সেই বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা কিরূপ কর্ত্তব্য হইতে পারে?

সপ্তমত— ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষতঃ আপনার মতো

লোকের পক্ষে কন্যার ভাবী ধনমান অপেক্ষা ধর্ম্মই পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বিষয়, কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তিনি জ্ঞাতচরিত্র ব্রাহ্ম নন, বিদ্যা সম্বন্ধে যদি দেখা যায় এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্তও দেন নাই। বিশেষতঃ পাত্র যদি রাজা না হইয়া মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান হইতেন তাহা হইলে বোধহয় এরূপ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দিতেও আপনি কখনওই সম্মত হইতেন না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে কন্যাদান করিলে লোকে সহজে মনে করিবে যে আপনি কন্যার ভাবী ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি দেখা অপেক্ষা কন্যার রাজরাণী হওয়া অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। এরূপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শোচনীয় নহে?

আমরা আবার বলিতেছি— এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ আমাদের মর্ম্মে আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বারবার বলিতেছি, আমরা বাল্যবিবাহকে অত্যন্ত জঘন্য প্রথা এবং পিতামাতার পক্ষে তাহাতে লিপ্ত হওয়া পাপ মনে করি। এতদ্ভিন্ন আরও যে সকল আপত্তি আছে তাহাও বলা হইল। অবশেষে আমাদের অনুরোধ যে আপনি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের ভাবী মহৎ অনিষ্টের আশঙ্কা নিবারণ করিবেন।

পত্রটিতে স্বাক্ষর করেছেন, যথাক্রমে— শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, আনন্দমোহন বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ ভট্টাচার্য, কালীনাথ দত্ত, কিশোরীলাল মৈত্রেয়, দুকড়ি ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, রূপচাঁদ মল্লিক, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবীশ, যদুনাথ

চক্রবর্তী, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চৌধুরী, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ মৈত্র, ভুবনমোহন ঘোষ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত নিয়োগী এবং সত্যপ্রিয় দেব।

ইতিমধ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'সানডে মিরর'-এ সেই বহুপ্রত্যাশিত বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হলো— বিবাহ স্থির, অনুষ্ঠিত হবে ৬ মার্চ ১৮৭৮। ওই দিনই কেশববাবুর কাছে প্রতিবাদপত্র পৌঁছে দেবার জন্য গুরুচরণ মহলানবীশ, কালীনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কেশবচন্দ্রের কাছে গেলেন। নিজের হাতে তিনি পত্রটি গ্রহণ করেননি। করলেন তাঁর অনুগামী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র। হেমচন্দ্র সরকার লিখেছেন এই চিঠিটি, 'was reported that Keshubchunder Sen threw it into the waste paper basket.'

কুৎসাপ্রিয় জনজিহ্বায় কত কথাই না তখন উচ্চারিত হয়েছিল। কেশববাবু নাকি অর্থলোভে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। উড়ো চিঠি গেল— কেশবচন্দ্রকে হত্যা করা হবে। এমন সরলপ্রাণ মহৎ ব্যক্তিকে আপন কর্মের জন্য কত না মন্দকথা সে-সময়ে শুনতে হয়েছে।

প্রতিবাদপত্র প্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যে চারদিক থেকে কেশবচন্দ্রের কর্মের বিরোধিতা করে আরও বহু প্রতিবাদপত্র আসতে লাগল। 'সমদর্শী' পত্রিকা জুলাই ১৮৭৭ থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে-কারণে 'সমদর্শী' দল পুনরায় আর একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এই উত্তেজনার মুহূর্তে। ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁরা 'সমালোচক' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন— একান্ত দলগত ও উদ্দেশ্যমূলক একটি পত্রিকা। একটি ইংরেজি পত্রিকাও— 'Brahmo Public Opinion'— মার্চ মাস থেকে প্রচারিত হলো। সম্পাদক— দুর্গামোহন দাসের ভাই

ভুবনমোহন দাস। শিবনাথ শাস্ত্রী পেলেন বাংলা কাগজটির সম্পাদনার ভার। দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু দুজনে মিলে কাগজের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে লাগলেন। নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান গণতান্ত্রিক আদর্শ তখন তাঁদের তাড়না করছে। 'সমালোচক'-এ কেশববিরোধী ব্রাহ্মগণের— কলকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের— মতামত প্রকাশিত হতে লাগল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে সম্পাদিকা মিস কলেট লিখেছেন :

'The Kuch-Behar Marriage agitation soon gave rise to the issue of other periodicals. The 'Samalochak' (or 'Review') now a secular weekly was started on Feb. 17'.

'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে ১ মার্চের সংখ্যায় লিখেছে— "''সমালোচক'— সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে।" অর্থাৎ 'কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা' পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জানুয়ারি মাসে শিবনাথ, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মারফত বিবাহের কিছু কিছু সংবাদ জ্ঞাত হয়েছিলেন। কিন্তু এ-সময়ে কুচবিহারে 'সমালোচক'-এর দু-একজন 'বিশেষ প্রতিনিধি' ছিলেন। তাঁরা সম্পাদককে গোপনে বিবাহের গোপন ও বিস্তারিত বার্তা সরবরাহ করছিলেন। সম্পাদক তখন সরল ছদ্মনাম নিয়েছেন— 'সারস পাখী'। ধারাবাহিকভাবে তিনি বিবাহের বিচিত্র সংবাদ 'সারস পাখীর উক্তি' নামে লিখতে আরম্ভ করেছেন। অনুমানে বাধা নেই, 'পাখী'র চঞ্চুতে কিছু অধিক পরিমাণে বিদ্বেষ, কৌতুক ও তির্যক রস বিদ্যমান ছিল। সম্পাদকের চঞ্চুবিলাস ব্যতীত এর বিভিন্ন সংখ্যায় কুচবিহারে

অনুষ্ঠিতব্য বিবাহের প্রতিবাদ করে যেসব পত্র আসতে আরম্ভ করেছিল—তার কোনো-কোনোটি মুদ্রিত হয়েছিল। মিস কলেটের 'ব্রাহ্ম ইয়ার বুক'-এ এসব চিঠির ইংরেজি ভাষান্তর মুদ্রিত রয়েছে। যেমন, 'ব্রাহ্ম ইয়ার বুক'-এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রায় কুড়িজন ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র রয়েছে। এঁরা কেশবচন্দ্রকে লিখেছেন (যেমন মিস সোফিয়া ডবসন কলেট অনুবাদ করে দিয়েছেন)—

> We could not even have imagined that any act of yours would ever be obstacle to female education or injurious to women; we are therefore exceedingly grieved at this unexpected act.

দ্বিতীয় সংখ্যাতেও (২৩-২-৭৮) ডা. প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ ঢাকার আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদের বারোজনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল। আর মুদ্রিত হয়েছিল রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর স্বামী হরগোপাল সরকারের একটি ব্যক্তিগত প্রতিবাদপত্র।

বিবাহের দিন অর্থাৎ ৬ মার্চেও পত্রিকাটির একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতে বিক্রমপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন গিরিজাসুন্দরী দাসী, রাজলক্ষ্মী সেন প্রমুখ। এ-সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পত্রটি হলো আনন্দমোহন বসুর। একটা কথা বেশ বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজের সকল স্তরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। নরমপন্থী শিবনাথের পরিবর্তে কিছুদিন পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'সমালোচক'-এর সম্পাদন-ভার দেওয়া হয়। 'তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।'

৪

এই প্রকারের একটি অস্থির অবস্থার মধ্যে নেতৃগণ ধীরভাবে কাজ করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এঁরা ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় কাজকর্মের তদারকি করবেন। এ-কারণে 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি' নামে একটি সভা স্থাপিত হলো। অ্যালবার্ট হলে সভা আহূত হলো। কেশবচন্দ্র এখানে সভা করার অনুমতি আগেই দিয়েছেন। সভা হবে তেইশে ফেব্রুয়ারি তারিখে। সভারম্ভের পূর্বে গ্যাসের আলো জ্বালানো নিয়ে বিভ্রাট উপস্থিত হলো। কালীনাথ দত্ত গোলমাল মেটানোর জন্য কেশববাবুর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁকে তিরস্কার করলেন। যা হোক সে-দিনে মিটিং হতে পারল না। আটাশে ফেব্রুয়ারি টাউন হলে সভা আহ্বান করে 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি' গঠিত হয়। ১ মার্চ সেই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে।

অবশ্য তেইশ তারিখে প্রতিবাদকারিগণের মিটিং ভন্ডুল হয়ে গেলেও পরদিন চব্বিশে ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্রের সমর্থনকারিগণ হরিশচন্দ্র শর্মার সভাপতিত্বে উক্ত অ্যালবার্ট হলেই একটি সভা করেন। হরিশচন্দ্র ছাড়া উক্ত সভায় আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নবগোপাল মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রাজকৃষ্ণ মিত্র, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল পাইন প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলেছি, প্রতিবাদকারিগণের সভা তেইশের পরিবর্তে আটাশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনীতে (পৃ. ১৬৫-৬৬) ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের তথ্যানুসরণে লিখেছেন— "হলটি ৩০০০ দর্শকে পূর্ণ হইল। একটি সঙ্গীত হইয়া সভার কাজ আরম্ভ হয়। পরে শিবচন্দ্র দেব মহাশয়

কার্য্যবিবরণীটি পাঠ করিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি অতি সুললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিলেন, তৎপরে দুইটি resolution হয়— প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি শিবনাথ উত্থাপন করেন এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি গঠিত হয়'।" কমিটির সদস্য সংখ্যা হলো উনিশ। এঁরা হলেন— রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন (ভট্টাচার্য), শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য), আনন্দমোহন বসু, ভগবানচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, যদুনাথ চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার রায়, দুর্গামোহন দাস, সর্বানন্দ দাস, কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গুরুচরণ মহলানবীশ, জগন্নাথ রায় ও নবীনচন্দ্র রায়। বোধ হয় বলা ভালো, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মূল বীজটি এই সভাতেই উপ্ত হয়েছিল।

৫

যেমন স্থির ছিল, তেমনি বিবাহকার্য সম্পন্ন হলো ৬ মার্চ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ, ২৩ ফাল্গুন ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। কেশবচন্দ্র কন্যার পিতা, আপাতত কন্যাসম্প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দর্পভরে হিন্দুবিবাহের সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা ও লোকাচার সম্পাদন করতে লাগলেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন কেশবচন্দ্রের পক্ষে বিবাহের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য। তিনি দেখলেন, অবস্থা যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে তাঁর করণীয় কিছু নেই। এমনকী ব্রহ্মোপাসনার সাড়াশব্দটিও শ্রুতিগোচর হলো না। সেই কেশবচন্দ্র, যিনি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ থেকে রাত্রিতে

শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত, সম্ভবত স্বপ্নেও যিনি ব্রহ্মের নিরন্তর নামধ্যান করেন, তাঁর বড়ো আদরের 'বড় পুঁটি'র বিয়েতে ব্রহ্মের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করা হলো না। আগুন জ্বেলে হোম করা হলো— দ্বিজতনয়ের বিবাহ সম্পূর্ণ হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত সব সহ্য করছিলেন কেশবচন্দ্র। কারণ রাজপক্ষ তাঁকে আগেই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছিল— এসবগুলো করা হবে— নান্যো পন্থাঃ। কিন্তু রাজকুলের প্রাচীন প্রথাকে মর্যাদা প্রদানের জন্য (এবং কেশবচন্দ্রকে অপমানিত করার জন্যও সম্ভবত) যখন সভাস্থলে হরপার্বতীর দুটি মূর্তি স্থাপিত হলো, তখন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং অন্য কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে এ-কার্যের প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা 'পদার্থ' দুটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি রাজকুলের অভিমানকে স্পর্শ করল না। ব্রিটিশ সরকারের সেই মুহূর্তে সম্ভবত স্মৃতিলোপ ঘটেছিল। প্রতিশ্রুতি শ্রুতির পর্যায়ে রয়ে গেল— কার্যে পরিণত করার দায় গ্রহণে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। অপমানের ভারা পূর্ণ করার জন্যে কেশবচন্দ্রকে ছাদনাতলার সভাস্থলে পর্যন্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি— দূরে একটি স্থানে তাঁদের উপবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। অগত্যা সেই দূরস্থিত স্থানে বসেই তাঁরা যখন ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করতে লাগলেন, 'অমনি টমটমের কর্কশধ্বনির সাহায্যে' তাকে অবসিত করে দিল রাজচক্রান্ত।

এই রাজচক্রান্তের আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটনের প্রয়োজন আছে। কারণ ১৮৭২ সালের তিন আইনের দায় বহনে এই বিবাহে কেশবচন্দ্রের কতখানি ভাগ ছিল তা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে। কুচবিহার তখন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অভিভাবকত্বে মানুষ হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার সহসা শাসনতন্ত্র পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতিতন্ত্র গ্রহণে অহেতুক উৎসাহ প্রকাশ করেনি। কেশবচন্দ্রের মতো উদার সরলপ্রাণ মহৎচিত্ত মানুষ সর্বযুগে আকাঙ্ক্ষার যোগ্য। কিন্তু সর্বত্র সরল হওয়াটা বোকামির লক্ষণ। বিশেষত রাজত্বটা 'কানিং ফক্স' ইংরেজের। শাসন

কেমন করে করতে হয়, এই জাতিটির তা বিলক্ষণ জানা ছিল। জানা ছিল, যতদিন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে থাকবে, ততদিনই তাদের মৌরুসিপাট্টা। ভারতবাসী কোনোদিনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, যদি জাতিতে জাতিতে সাম্প্রদায়িক কারণে তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। শাপে বর হয়েছিল খ্রিস্টপন্থী একেশ্বরবাদী ব্রিটিশ সরকারের। তারা সর্বদা এই বিভেদের সীমারেখাটি স্পষ্ট রাখতে চাইত। কারণ সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে একবার যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে পুনরায় তাদের লাঙ্গুল কুণ্ডলীকৃত করে সাগরের অপর পারে প্রস্থান করতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ আস্তিক সমাজে ঐক্য সন্ধান করছে দেখে কিছুদিন পূর্বেই এই প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল শঙ্কিত ইংরেজ সরকার। এ-কথা তখন বোঝা যায়নি। ১৮৭২ সালের 'তিন আইন' পাস করাতে গিয়ে তারা ব্রাহ্মসমাজকে বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কেশবচন্দ্রকে দিয়েই তারা বলিয়ে নিয়েছিল— 'আমি হিন্দু নই'। তবুও কেশবচন্দ্রের ডায়নামিক সামর্থ্যকে তারা ভয় পেয়েছিল (যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনশক্তি এ-কালের মধ্যে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল)। বুদ্ধিজীবী ভারতবাসী বলতে তখন (অন্তত বঙ্গদেশে) তারা ব্রাহ্মদেরই বুঝত। কেশবচন্দ্র সেন এঁদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা। কাজেই কেশবচন্দ্রকে আরও একবার সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার সুচতুর ঘৃণ্য কৌশলে তারা নামল। কেশবচন্দ্রকে তারা এই বিবাহের ব্যাপারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিল, শুধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য। সাধনার নিভৃত কাননে সংস্কারপন্থী কেশবচন্দ্রকে সরে যেতে বাধ্য করে, তাঁর বীর্যদীপ্ত সামর্থ্যকে অপমানের আঘাতে নির্জীব করে দিয়ে, তাঁর আচরণ ও মতামতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পার্থক্য দেখিয়ে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করে। আবার বলি 'কানিং ফক্স' ব্রিটিশ সরকার তাদের শানিত উদ্দেশ্য সফল করল। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন, 'কেশবচন্দ্রকে কুচবিহারের

রাজপুরুষেরা একটা ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।'

অথচ কেশবচন্দ্র বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন কোনো ষড়যন্ত্রের বলি হবার জন্য নয়। কোনো খ্যাতির জন্যও নয়। দীনকণ্ঠে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, 'দীনবন্ধু আমি মার খাইয়াছি, অনেক সহিয়াছি, কিন্তু যখনই তুমি চাহিলে, তখনই তোমার পদতলে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। আমার কন্যা নয়, তোমার সমাজের কন্যা, প্রেরিতদিগের কন্যা। তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না।' 'বঙ্গদেশের দুই শাখায় বিবাহ' দেবার জন্য, কোচবিহারে অমৃত ঢালবার জন্য, 'নবরক্ত দিয়া নব ইস্রেল এই বিহারকে নির্মাণ' করার জন্য তিনি 'দুঃখিনী' কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। ভরসা ছিল কন্যা সুনীতির সঙ্গে 'সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে।' কিন্তু কোন ইচ্ছার কিবা ফল! (বিবাহানুষ্ঠানের পরেই অবশ্য মহারাজা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন এবং সুনীতি দেবী পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনান্তর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে সর্বসমক্ষে ২০ অক্টোবর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে পরিপূরক বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়)। ভগ্নহৃদয়ে আঠারোই মার্চ কেশবচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন।

৬

অনেক জল গড়িয়ে গেল। অনেক বাদবিসংবাদ হলো। 'সমালোচক' -এর প্রথম সম্পাদক সতেরো ঘণ্টা একনাগাড়ে পরিশ্রম করে লিখলেন, 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ?' নামে আটাশ পৃষ্ঠার মধুর-তিক্ত-কষায় একটি পুস্তিকা। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হয়েছিল কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে 'কপালে

ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?' শীর্ষক ব্যঙ্গনাটিকার প্রকাশ। রাগের মাথায় আচার্যপত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবীকে পর্যন্ত অমার্জিত আক্রমণ! কেশবপক্ষীয়েরাও কম লিখলেন না 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রিকায়।

আসল কথা, ভাঙা মন আর জোড়া লাগল না। মিটিং ডেকেও কেশবচন্দ্রকে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে অপসারিত করা গেল না, তখন তাঁরা পৃথক একটি সমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। এই বিবাহের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি নতুন ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগ্রহ করে প্রতিষ্ঠিত হলো ১৫ মে ১৮৭৮ তারিখে। পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্গসমাজকে মন্থন করে নবজাত শিশুর জন্ম হলো।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১৮৭৮

এ-অধ্যায়টি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ এটি ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মুখ্যত শেষ পর্যায়। তা ছাড়া কোনো বিশেষ ব্যক্তি এর প্রতিষ্ঠা করেননি। ফলে ব্যক্তিতন্ত্রের বদলে একটা নিয়মতন্ত্রকে এখানে প্রাধান্য পেতে দেখি। সমাজোন্নয়ন প্রভৃতি কাজের সঙ্গেও এই পর্যায়টি সবচেয়ে সক্রিয় ছিল।

আগের অধ্যায়ে আমরা কেশবচন্দ্রবিরোধী একটি দলকে সক্রিয় হতে লক্ষ করেছি। এই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে তিন প্রকার বিশিষ্টতা লক্ষ করা গেছে— এক. বিভিন্ন নেতার চিন্তাভাবনা এখানে গোষ্ঠীরূপ লাভ করেছিল, দুই. ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া সাধারণ সামাজিকেরা অনেকেই এঁদেরকে সমর্থন করেছিলেন, এবং তিন. এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা পুষ্টিলাভ করতে আরম্ভ করেছিল।

কেশবচন্দ্রের উপর বিরক্ত হলেও 'ঘোষ ভাইয়েরা' তখনও ব্রাহ্মমত ত্যাগ করেননি। মতিলাল ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান Indian League প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়া ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Indian Association বা ভারত সভা। রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্য ধনীদের নানা প্রতিষ্ঠান— ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন— আগে থেকেই ছিল। এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণিদেরও একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হলো। আনন্দমোহন বসু সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহসম্পাদক এবং শিবনাথ শাস্ত্রী এর চাঁদা আদায়ের

ভারপ্রাপ্ত সদস্য নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই কেশববিরোধী দলভুক্ত ছিলেন।

কিন্তু আমাদের মনে আছে যে, ব্রাহ্মসমাজ মূলত একটি ধর্মসমাজ। সেজন্য অনেকেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বিশেষভাবে অনুভব করতেন। এঁদের মধ্যে পঞ্চপ্রধান ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত এবং উমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁরা ধর্মোপদেশের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যেতেন। দেবেন্দ্রনাথও এই 'পঞ্চপ্রদীপ'কে নানাভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

২

এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ সমাগত হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের তিন আইনের দায়িত্ব কেশবচন্দ্রকে বইতে হলো। আসলে—'কেশবচন্দ্রকে কুচবিহারের রাজপুরুষেরা একটা ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।'[১] এই বিষয়টি আমরা সবিস্তারে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হলো ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। এর মন্দির প্রতিষ্ঠাকর্ম সম্পাদিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। এই কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নববিধান'—ফলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নবরূপায়ণ ঘটেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা করার সুযোগ নেব। তবে এখানে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজে ভাঙনের পরিবর্তে মিলন বা

---

১. বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ. ৫৯৯।

ঐক্য স্থাপনে প্রস্তাব রেখেছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাছে, যদিও তা কার্যকরী হয়নি। এতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

'কুচবিহার-বিবাহ' ঘটনার পর ১৮ মার্চ ১৮৭৮ তারিখে কেশবচন্দ্র কুচবিহার থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁকে মন্দিরের আচার্য পদ থেকে অপসারণের চেষ্টা চলতে লাগল। প্রথমে কেশবচন্দ্র কোনো মিটিং ডাকতে সম্মত না হলেও শেষ অবধি ২১ মার্চ তারিখে এক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একটি মিটিং ডাকলেন— 'Babu Keshub Chunder Sen will propose that Babu Keshub Chunder Sen be deposed'। নানা বিরোধিতার মধ্যে এ-দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্রের অপসারণের প্রস্তাব তুলতে গেলে তিনি সদলবলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তবুও সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদ থেকে অপসারিত করা হবে। তা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র মন্দিরের উপর তাঁর অধিকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

এই বিবাদবিসংবাদের মধ্যেই মফস্সলের বিভিন্ন সমাজ ব্রাহ্মসমাজ কমিটিতে ভিন্ন সমাজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দচন্দ্র মিত্র 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' এবং 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?' পুস্তিকায় আচার্য কেশবচন্দ্রকে— এমনকী পরবর্তী পুস্তিকাটিতে আচার্যপত্নীকে পর্যন্ত আক্রমণ করে বসলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেই লিখে গেছেন— 'এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না. . . ব্রাহ্মসমাজ এতদ্বারা লোকসমাজে যে হীন হইয়াছে তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।'[1]

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ), পৃ. ১৫০।

যাই হোক, ২৪ মার্চ ১৮৭৮ থেকে পৃথকভাবে উপাসনা শুরু হলো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের পার্শ্ববর্তী উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্যের কাজ করলেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই প্রথম পৃথক উপাসনা আরম্ভ হইল।'[১] শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের আচার্যত্বে প্রতি রবিবার ওই গৃহেই উপাসনা চলতে লাগল।

এরপর ব্রাহ্মসমাজ কমিটির উদ্যোগে ব্রাহ্মদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৫ মে ১৮৭৮ তারিখে যে-বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হলো তাতে 'কুচবিহার বিবাহ দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে. . . তাহা নির্ধারণ' করার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। সভায় চার-শোর বেশি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আদি সমাজের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়া Mr. Macdonald, Rev. Hector ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত হন। সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। ছাব্বিশটি সমাজের মধ্যে তেইশটির সমর্থনে, ৪২৫-জন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার মতানুকূল্যে এবং ২৫০-টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে ১৭০-টি পরিবারের সম্মতিক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। শিবচন্দ্র দেব প্রথম সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম সহসম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অন্যান্যদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মোট ৩৫-জন সাধারণ সভার সভ্য নিযুক্ত হলেন।

আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব করেন এবং রজনীকান্ত নিয়োগী তাঁকে

---

১. কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত।

সমর্থন করেন। অন্য সদস্যেরা ছিলেন— রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার ভট্টাচার্য, ভগবানচন্দ্র বসু, কালীনাথ দত্ত, দুকড়ি ঘোষ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরকুমার চৌধুরী, যদুনাথ চক্রবর্তী, নবকুমার চক্রবর্তী, ভুবনমোহন দাস, দুর্গামোহন দাস, পার্বতীচরণ দাস, সর্বানন্দ দাস, ভুবনমোহন সেন, কালীশঙ্কর সুকুল, পদ্মহাস গোস্বামী, বরদাকান্ত হালদার, গুরুচরণ মহলানবীশ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, রামদুর্লভ মজুমদার, রজনীকান্ত নিয়োগী, মধুসূদন রাও (কটক), কালীনারায়ণ রায়, প্রসন্নকুমার রায়, রজনীনাথ রায় এবং চণ্ডীচরণ সেন।[১]

এ ছাড়া এই সভায় আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেটি হলো— 'দুই মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের জন্য নূতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভ্য সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করা চাই।' অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে সচেষ্ট হলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'একটি পাকা constitution'-এর উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন।

সেইমতো আনন্দমোহন বসু, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখর পরিশ্রমে একটি সংবিধান রচিত হলো। ব্রাহ্মসমাজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এর সংবিধান স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হবার আগেই স্ত্রী-পুরুষ, আয়, বৃত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সকল বয়স্কের ভোটদানের অধিকার (adult franchise) মেনে নিয়েছিল— এমনকী লন্ডন সমেত বহু ইউরোপীয় দেশ যখন এই অধিকার মেনে নেয়নি! গণতন্ত্রের এই বাণীই তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় ধ্বনিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে— 'by placing

---

১. হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ. ১৭৪-৭৫।

justice over injustice, equality over inequality, power of the people over the king, is making arrangements to establish a Worldwide Republic. This all-sided attitude is a matter of special pride for the Brahmo Samaj. It is for this spirit of independence that many people are flowing here.'[১]

এইসঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামকরণটির প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এই নামকরণের উল্লেখ করেন। পরে ১৫মে-র সভায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ববর্তী ব্রাহ্মসমাজে 'একনায়কত্বের বিষময় ফল' প্রত্যক্ষ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনের প্রস্তাব করেন— কারণ এতে 'প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজের কার্যে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই নামকরণ সমর্থন করে বলেন— "বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজ 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া যাও।"[২]

এই নামকরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রাচীনেরা এতে 'লঘুত্ব' লক্ষ করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষেরা একে যথেচ্ছ অধিকারের সাধারণ সম্পত্তি ভাবতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাই মন্তব্য করেছেন— "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাব বুঝিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ, দোষ প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়। ইহা অনেক পরিমাণে ঐ নাম গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়।"[৩]

---

১. দ্র. Studies in Bengal Renainssance, Jogananda Das-এর প্রবন্ধ The Brahmo Samaj

২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ), পৃ ১৫৩।

৩ তদেব, পৃ. ১৫৩।

১৫ মে ১৮৭৮, ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্বকৌমুদী' আত্মপ্রকাশ করল ২৯ মে, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। এ ছাড়া Brahmo Public Opinion ছিলই।

প্রথম দিকে ১৪ কলেজ স্কোয়ারে গুরুচরণ মহলানবীশের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অধিবেশন বসত। নবপ্রতিষ্ঠিত এই সমাজে যে-স্বাধীনতার আদর্শ ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দেখা দিল তাতে বহু যুবক আকর্ষিত হতে লাগলেন। আদিসমাজ তার নীতি গ্রহণ করার জন্য নতুন সমাজের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। এই মর্মে রাজনারায়ণ বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৫ জুন '৭৮ তারিখে একটি চিঠিতে লিখলেন—

'I think you ought to decide soon whether you should adopt a strictly Hindu mode of propagation, for if you do not adopt it at once, the Arya Samajes bid fair to outstrip the Brahmo Samajes as has been the case at Monghyr and elsewhere. The Arya Samajes should not be allowed to do so as Brahmo Dharma has greater claim to the veneration and love of people, being the 'Sara Dharma' according to their own admission.'[১]

আর্যসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মগত সংঘাতের উদ্‌বেগ এই চিঠিতে ফুটে উঠেছিল। 'সার ব্রাহ্মধর্ম'কে রক্ষার জন্যই এই ঐক্যবদ্ধতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেনি, তবে তাঁরাও ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মধ্যেই এই প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল। তাই প্রথমে চারজন প্রচারক নির্বাচিত হলেন— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী।

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০১ শক, ৪৩৪ সংখ্যা।

কিন্তু ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরে রামকুমার বিদ্যারত্ন এই সমাজ পরিত্যাগ করেন। গণেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয় এবং একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীই শেষ অবধি এই সমাজের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

৩

মহা-আন্দোলনের মধ্যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ অতিবাহিত হলো। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেনের ভাড়াবাড়িতে (এখন আনন্দ পাবলিশার্স-এর বইয়ের দোকান) সমাজের উপাসনা চলছিল। একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য ২১২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে একখণ্ড ভূমি সংগৃহীত হলো। প্রত্যেক সভ্যের এক মাসের বেতন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাত হাজার টাকার 'unconditional gift', সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের সরদার দয়াল সিংহ প্রভৃতির দানে ক্রীত জমিখণ্ডের উপর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ মাঘ মাঘোৎসবের সময় মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব। আনন্দমোহন বসু, ডা. প্রসন্নকুমার রায়, সরদার দয়াল সিংহ, উমেশচন্দ্র দত্ত, দুকড়ি ঘোষ, ভগবানচন্দ্র বসু, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এই সমাজে ট্রাস্টি নিযুক্ত হলেন।

পুনশ্চ ১৮৭৯ খ্রিস্টাদের জানুয়ারি মাসে তিনটি সমাজকে একত্র করার চেষ্টা দেখা দিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাঙ্গণে আহূত এক সভায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে দু-একজন দর্শক ছাড়া জন্য কেউ উপস্থিত না হওয়ায় এ-চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

এই মাসেই সিটি স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম গঠনমূলক কাজ। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো

ছাত্রসমাজও (২৭ এপ্রিল ১৮৭৯)। ধর্ম ও নীতির সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করা হলো।

১৮৮১ সালের ১০ মাঘ মন্দির সম্পূর্ণ হলে তার দ্বারোদ্‌ঘাটন হলো। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। মূল ও শাখা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটিতে সংযুক্ত হলো রবিবাসরীয় নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়। প্রধানত এই সমাজের উদ্যোগেই নারীপ্রগতি সূচিত ও ত্বরান্বিত হলো। তাঁরা পেলেন ভোটের সমানাধিকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্নাতক, চিকিৎসক ও ধাত্রী হলেন এই সমাজভুক্ত মেয়েরা। তাঁরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন, ধর্মের আচার্য হয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে লাগলেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তার নেতৃত্ব দিলেন। জনসভায় বক্তৃতা এবং প্রকাশ্যে গান করা, সমুদ্র পার হওয়া, এমনকী নিজেদের স্বামী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মনারীরা সমাজে বিপ্লব সংগঠন করলেন, সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে দিলেন। সহশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হলো।

এ ছাড়া ১৮৩২ সালে কটকে 'কটক বন্যাত্রাণ ভাণ্ডার' খোলার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের মানবহিতৈষণার যে-কাজ শুরু হয়েছিল, কেশবচন্দ্রের 'ভারত সভা'য় যে-charity-র সূত্রপাত ঘটেছিল তা-ই বীরভূম-নলহাটির দুর্ভিক্ষত্রাণ (১৮৮৫), ত্রিপুরার ত্রাণ তহবিল (১৮৮৭), ঢাকা (১৮৮৮), চব্বিশ পরগনা (১৮৯২), মাদারীপুর (১৮৯৪), জগদীশপুর, মহেশমুণ্ডা, এলাহাবাদ, টাঙ্গাইল (১৮৯৭), মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, রাজপুতানা (১৯০০) প্রভৃতি অস্থায়ী সমাজ সেবাকার্যে অগ্রশীল হয়েছিল এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

স্থায়ী সেবামূলক কাজের মধ্যে আগ্রাতে National Asylum for Orphans and Destitute Children (১৮৭৭), কলকাতায় Deaf and

Dumb School (১৮৯৩), দাসাশ্রম (১৮৯১) প্রভৃতি ছাড়া বহু দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর বহুপূর্বেই হরিজনদের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজই প্রথম এগিয়ে এসেছিল। এ ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাধনাশ্রম (১৮৯৩)। হরিজন উন্নয়নের জন্য উত্তর ভারতে স্থাপিত হয়েছিল বিঠলরাম সিন্ধের প্রচেষ্টায় 'Deperssed Classes Mission Society' (১৯০৬)। হরিজনদের জন্য অবৈতনিক সাধারণ ও শিল্পশিক্ষালয়, আবাসগৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনে, নাগপুর, হুবলি ও বাঙ্গালোরে এর শাখা খোলা হয়। বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত এর শাখাটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রেজেস্ট্রিকৃত হয়। ১৯৩১-৩২ হরিজনদের জন্য বাংলা ও আসামে ৪৪১-টি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ১৯৩২ সালের মধ্যে ৪৫,০০০ হরিজন সাক্ষর হন। ১৮৮৯ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নীলমণি চক্রবর্তীর উদ্যোগে খাসি মিশন। পাহাড়ি উপজাতিদের জন্য (গারো রভাসদের) এ-সেবাকার্য আরও প্রসারিত হয় প্রচারক অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর প্রযত্নে। হাজারিবাগের মেথর, মাদ্রাজের পঞ্চম, আলেপ্পির এজভাস এবং উড়িষ্যার হাড়িদের মধ্যে উন্নয়ন কার্য ছড়িয়ে পড়ে। এসব কাজের মাধ্যমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সমাজের প্রায় সমস্ত অংশকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল।

নববিধান

১৮৮০

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত নতুন ধর্মমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন— "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থ সকলের সমালোচনাই প্রধান রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ১৮০১ শকের ১২ মাঘ (জানুয়ারি, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) 'নববিধান' ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান সমাজ' নামে বিখ্যাত হইল এবং ঐ সমাজের লোকেরা আপনাদিগকে নববিধান সমাজের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।"

'নববিধান' শব্দটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো সর্বধর্ম সমন্বয় বা ধর্মের সমন্বয়মার্গ। কেউ যদি ভাবেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রেই কেশবচন্দ্রের মনে এই বিশেষ ধর্মভাব জেগেছিল— তিনি সম্ভবত ঘটনার ঐতিহাসিকতার প্রতি সুবিচার করবেন না। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাঁর *Religion of Love* প্রবন্ধ অথবা সকল প্রকার দেশীয় শাস্ত্র থেকে 'প্রবন্ধ সংকলন', 'শ্লোক সংগ্রহ'র (১৮৬৬) প্রকাশ অথবা পৃথিবীর সব ধরনের শাস্ত্রচর্চায় তাঁর মণ্ডলীকে গবেষণায় নিয়োগের মধ্য দিয়েই তাঁর সমন্বয়ধর্মিতা প্রকাশ পাচ্ছিল।[১] সে-দিক থেকে হয়তো নববিধানকে একেবারে ব্রাহ্মধর্মবহির্ভূত কিছু ব্যাপার

১. এ-বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য কৃষ্ণবিহারী সেন রচিত 'নব-বিধান কি?' পুস্তক।

বলে ভাবা সংগত নাও হতে পারে। রামমোহন রায় তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট-ডিডে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরকে সর্বজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করে গেছেন।

কিন্তু নববিধান সমাজের ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা এর মধ্যে পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য ত্রুটি লক্ষ করতে লাগলেন। নববিধানে গৃহীত আরতি-অনুষ্ঠান, নিশানবরণ, হোমানুষ্ঠান, নবান্ন উৎসব প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুধর্মের পূজাপদ্ধতিকেই লক্ষ করা গেল বলেই তাঁদের অভিযোগ শোনা যেতে লাগল। কিন্তু নতুন ব্যাপারও লক্ষ করা গেল। উপাসনার মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রদান, প্রত্যাদেশ এবং ভক্তির বাহুল্য দেখা গেল। উদ্‌বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, শাস্ত্রচর্চা এবং উপদেশমুখী উপাসনা, ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন যোগে অভিনব রূপ পেল। 'এই দেখিয়াই নব-বিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব-ব্রাহ্মধর্মকে। অন্যে আংশিক ভাব রাখিতে পারেন, নব-বিধানে তাহা কখনওই হইতে পারে না' (কেশবচন্দ্র সেন, জীবন বেদ, পৃ. ১১৮)। হিন্দুধর্মের পরিবর্তে 'গগনে·সার্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল।' বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরান একত্রিত হলো।

নববিধানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দিল, তার সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এই ধরনের— ক) ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান এবং তিনি নিরাকার। খ) ঈশ্বর পিতৃভাবে, পুত্রভাবে এবং পবিত্রাত্মার ভাবে বর্তমান। গ) মূর্তিপূজা স্বীকার না করলেও অবতারবাদে বিশ্বাস। ঘ) সমন্বয়ী ধর্ম বলে এতে কোনো ভক্তি, যোগ ও কর্ম সমন্বিত হয়েছে। বস্তুবিজ্ঞান থেকে ধর্মবিজ্ঞান— বিজ্ঞানের সব শাখা এর অন্তর্গত। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এখানে মিলিত। ঙ) এই 'জীবনের ধর্মে' জ্ঞানের চেয়ে জীবন বড়ো বলে 'প্রত্যাদেশে' (ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে উপলব্ধ হয়েছে ভেবে কর্মানুষ্ঠান) বিশ্বাসী এই ধর্ম। চ) এই ধর্ম বিশ্বজনীন, এবং ছ) ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা।— 'একবার কেবল বিশ্বাসী

হইয়া, হে ব্রহ্ম, হে জননী বলিয়া হরিকে ডাক।' (আচার্যের উপদেশ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। এখানে 'ডাক' শব্দের অর্থ প্রার্থনা করো। প্রার্থনা নববিধানের মুখ্য আচরিত ভাব।

এই ভাব যাঁরা অনুশীলন করবেন সেই প্রচারক সভার কেশবচন্দ্র নামকরণ করেন 'প্রেরিত দরবার'। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ এই দরবারের সদস্য নিযুক্ত হলেন। তাঁরা 'ভাই' এই পূর্বনাম সংযোগে পরিচিত হতে থাকলেন। কেশবচন্দ্র নিজে সস্ত্রীক নৈনিতালে গমন করে সেখানে কখনও একাকী কখনও সস্ত্রীক শিলাতলে বা ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করে একতারা হাতে নিয়ে সাধনে মগ্ন হতেন। পরে প্রচারকদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে নিজে কলকাতার রাজপথে নেমে সংকীর্তনসহ হরিলীলামাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলেন।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্দেশে রচিত এক পত্রে কেশবচন্দ্র নববিধানের সুসমাচার প্রকাশ করলেন। সেই পত্র ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহেও পাঠানো হয়েছিল। এতেও নববিধানের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে 'Nava Samhita' রচনা করলেন। এরপর কেশবচন্দ্র সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'কমল কুটির'-এ তাঁকে দেখতে এসে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "তোমার পীড়ার সংবাদে যতদূর দুঃখিত হইয়াছি, আমি আমার জামাতার মৃত্যুতেও তত দুঃখিত হই নাই। শুধু তোমাকে দেখিবার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি। তোমাকে আচার্য ও প্রচারক করিয়া পরিব্রাজক হইয়াছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তুমি আচার্য ও প্রচারক। ব্রাহ্মধর্ম চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এখন ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃতও হইয়াছে। আমেরিকায় প্রচারের বড় সুখ্যাতি হইয়াছে;

সেখানকার লোকেরা তাঁহার (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার) বাগ্মিতা, ভাব ও প্রেমের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছেন।"[১]

যাই হোক, শেষ অবধি ভয়ংকর পীড়ায় আক্রান্ত কেশবচন্দ্রের ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে মৃত্যু হলো।

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের সাধুতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু তাঁর নববিধান প্রবর্তন নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নানা প্রশ্ন উঠেছিল— বিশেষ করে পৌত্তলিকতার প্রশ্নে। কেশবচন্দ্রের মনের এই পরিবর্তনের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে দায়ী করা হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে প্রতিবার নববিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবের পরে একদিন কেশবচন্দ্র সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কীর্তন করতেন। কিন্তু মুশা, সক্রেটিস, শাক্যমুনি, ঋষিবৃন্দ, খ্রিস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য ও বিজ্ঞানীদের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (যথাক্রমে ২২ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৪ মার্চ, ২১ মার্চ, ৮ আগস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০ সেপ্টেম্বর ও ৩ অক্টোবর) স্মরণের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করা হয়নি।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে-সংযম ছিল তা তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সমগ্রত সঞ্চারিত থাকতে পারে না। ফলে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নববিধান সমাজের অধিকর্তৃত্ব নিয়ে গোলযোগ দেখা যায়। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে তাঁর অন্যতম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র বিদেশে ছিলেন। সে-সময়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই অন্য সদস্যেরা একত্রে মিলিত সিদ্ধান্ত নেন যে আচার্য পদ শূন্য রাখা হবে তাঁর সম্মানার্থে। আসলে তাঁরা প্রতাপচন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণে কুণ্ঠাযুক্ত ছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের জন্য

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্র. 'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য' (১৩৪৩), পৃ. ৮৩।

পৃথক একটি বেদি নির্দিষ্ট হলে তিনি এই নিয়মাবলী গ্রহণে অসম্মত হন। ফলে সংঘর্ষ দেখা দিল অনিবার্যরূপে, দরবার ভেঙে পড়ল বহু খণ্ডে। দরবারি দল এবং নিয়মতান্ত্রিক দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন 'শান্তি সমিতি' স্থাপন করলেন। তিনি নিজেই তখন The Liberal and the New Dispensation পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ-সময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অন্যদিকে নিজগৃহেই উপাসনাদি করছিলেন এবং The Interpreter নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত মোহিতচন্দ্র সেন এবং বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুতে তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ফলে লিলিকটেজ, দরবারি, ইয়ং মেনস প্রেয়ার মিটিং এবং ভাই প্রসন্নকুমারের চারটি দলের মধ্যে সংযুক্তীকরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এখন তা অবসিত হয়েছে। তবে এই সমাজের কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা একে সজীব রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

প্রাদেশিক ব্রাহ্মসমাজসমূহ

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা সংক্ষেপে কলকাতার বাইরে অবস্থিত শাখা সমাজগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য প্রদান না করি। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক কাজগুলি শাখা সমাজগুলি দ্বারাই তুলনামূলক সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হয়েছিল। বিভেদমূলক আচরণের চেয়ে এগুলি একটা ঐক্যভাবই বজার রাখার চেষ্টা করেছিল। এমনকী কলকাতা শহরস্থ দু-একটি শাখা সমাজ— যেমন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ— ব্রাহ্মসমাজগুলির ঐক্য বিধানে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবশত বর্ধমানের মহারাজা একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়ের সহানুভূতিক্রমে কৃষ্ণনগরে একটি সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ আচার্যের পরিবর্তে শূদ্র হাজারীলালকে আচার্য হিসাবে এখানে দেবেন্দ্রনাথ প্রেরণ করায় এ-সমাজটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্ধমানের সমাজটিও স্বল্পজীবী ছিল। আসলে এ-দুটি সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কোনো আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা কার্যকর ছিল বলে মনে হয় না।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ

হাইকোর্টের সুখ্যাত জজ শম্ভুনাথ রক্ষিত, উকিল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-খ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে সভাপতিত্ব, সহসভাপতিত্ব ও সম্পাদকত্বে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে (পরে ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ নামে খ্যাত ও অদ্যাপি জীবিত)। এর স্থাপনের পিছনে সরকারি বিচার বিভাগের কর্মচারী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু কাশীশ্বর মিত্রের অবদানও ছিল সুপ্রচুর। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। তবে এ-সমাজ নিজেদের নিয়মমতো চলেছিল, আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসরণ করেনি।

বৎসর খানেক পরে এই সমাজ 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভায় অনেকগুলি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত এক ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। এখানে দীক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র (পরে 'স্যার')।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর আদি ব্রাহ্মসমাজই এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। আর বেহালা থেকে ছ্যাকড়াগাড়ি চড়ে আসতেন আচার্য (আদি ব্রাহ্মসমাজের) বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। এরপরে সমাজে কিছুকালের জন্য নানা ভাঙন দেখা দিলেও শেষে তিনটি সমাজের প্রস্তাবক্রমে 'ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ' নামে এটি সংঘবদ্ধ হয় এবং এর একটি মন্দিরগৃহও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই এটির কার্যশক্তি বেড়ে যেতে থাকে। 'টমকাকার কুটির' অনুবাদক বিখ্যাত চণ্ডীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত কে. এন. রায়, আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ রামব্রহ্ম সান্যাল এবং অম্বিকাচরণ সেনের প্রত্যক্ষ সংযোগে এই সমাজে যে-প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তা অদ্যাপি বর্তমান। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে এর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

মে দি নী পু র ব্রা হ্ম স মা জ

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে সেখানকার ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন শিবচন্দ্র দেবও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন। ফলে মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়ে অচিরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বসু এখানে বেশ কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন, সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়। নিকটবর্তী গোপগিরি পর্বতের চূড়ায় বেশ কয়েকটি বিশেষ অধিবেশনও বসে। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে যোগ দেন রামমোহন রচনাবলীর যুগ্ম-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বসু। মেদিনীপুর দ্রুত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের কেন্দ্র হয়ে পড়ল।

আরও একটি বড়ো ব্যাপার ঘটেছিল মেদিনীপুরে এ-সময়ে। তা হলো বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সহযোগ। বিধবাবিবাহে উদ্যোগ দান ছাড়া রাজনারায়ণ নিজেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্রর বিবাহ দিলেন ব্রাহ্মবিবাহ মতানুসারে। বলা যেতে পারে রাজনারায়াণ বসুর সৌজন্যে বহু ব্রাহ্ম এই সুযোগে মেদিনীপুরে গমন করেন।

রাজনারায়ণ মেদিনীপুর ছেড়ে চলে গেলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ বসু এবং ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্গানারায়ণ বসু এর ভার গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ববৎ সহায়তা করতে লাগলেন। এরপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। শেষে এটি বসুপরিবারেরই মাত্র দায়িত্বে আসে এবং ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ে।

ঢা কা ব্রা হ্ম স মা জ

ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে কলকাতার পরই ঢাকার স্থান ছিল। এ-কথা সত্য যে, কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত। দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের কথা সবিশেষে অবগত হয়ে ব্রজসুন্দর মিত্র ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কাজে অগ্রসর হন। ৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬ খিস্টাব্দে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। খুব শীঘ্র উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এর সদস্য হন। পরে এই সমাজ পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হতে থাকে।

অভিভাবকদের ভয়ে প্রথম প্রথম গোপনে সভানুষ্ঠান হলেও শেষ অবধি উদয়চন্দ্র আঢ্যের প্রভাবে বাংলা বাজারের একটি বাড়িতে সমাজের কার্য পরিচালিত হতে থাকে প্রকাশ্যভাবে। পণ্ডিত রামকুমার বেদপঞ্চানন নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এর উপাসনাদি পরিচালনা করতে থাকেন। প্রখ্যাত মনোমোহন ঘোষের পিতা স্বয়ংখ্যাত রামলোচন ঘোষ, রামশঙ্কর সেন, চন্দ্রকিশোর বসু প্রমুখ ধীরে ধীরে এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। রক্ষণশীল বেদপঞ্চাননের পরিবর্তে এলেন পণ্ডিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে (অক্টোবর ১৮৪৭)। গৃহ থেকে বিতাড়িত ব্রজসুন্দর মিত্রর ভাড়াবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজটি কিছুকাল পরে উঠে এলো। সাত বছর ধরে এই সমাজ সেখানে থাকল। তখন সম্পাদক ছিলেন হারাণচন্দ্র সরকার এবং সহসম্পাদক ছিলেন নন্দকুমার গুহ। পরে আর্মানিটোলায় একটি সদ্যক্রীত গৃহে সমাজ স্থান পায়। এ-সময়ে পুত্রদ্বয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে সমাজকে উৎসাহিত করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও দীননাথ সেনের মতো পদস্থ ব্যক্তিরা এর সদস্য হন। শুধু তা-ই নয়, এর সঙ্গে

সংযুক্ত হলেন 'সদ্ভাবশতক'-এর বিখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্যক্তিগণও।

লক্ষ করার ব্যাপার, নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁরা কেশবচন্দ্রের শরণাপন্ন হলে তিনি সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে দশ মাসের জন্য পাঠিয়ে দেন। এখানে একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ও স্থাপিত হলো। এবারে সংযুক্ত হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ফলে হিন্দুসমাজে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তবুও বঙ্গচন্দ্র রায় এবং ভুবনমোহন সেনের মতো সদস্যরা এতে যোগ দিলেন। আরও যোগ দিলেন কালীমোহন দাস ও দুর্গামোহন দাস দুই ভাই। পরে এলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেনও। সমস্ত ঢাকা জেলা উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো সঙ্গত সভা। উল্লেখযোগ্য বিষয়, মুন্সী জালালুদ্দিন মিয়া নামে জনৈক মুসলমান প্রকাশ্যে দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। সমস্ত হিন্দুসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাঁরা এক সভা প্রতিষ্ঠা করে 'হিন্দুহিতৈষিণী' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে প্রবল বিরোধিতা করতে লাগলেন। তবুও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হলো না। বিধবাবিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা সমাজে নতুন হাওয়া বইয়ে দিতে থাকলেন। কেশবচন্দ্র পুনশ্চ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে নিয়ে ঢাকা এসে নবোদ্যম দান করলেন। ইতিমধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমাজ ত্যাগ করলে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কলিকাতা থেকে এসে সে-স্থান পূরণ করলেন। অবশ্য এই বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল কার্যকর থাকেনি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদলে ফিরে এলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গবন্ধু' নামে একটি বাংলা মাসিকপত্র এর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং সঙ্গত সভার উদ্যোগে 'শুভসাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে মদ্যপান ও বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন করতে থাকে। কিছুদিনের জন্য 'শুভসাধিনী' নামে একটি পত্রিকাও

প্রকাশিত হয়েছিল। 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পুনশ্চ ঢাকা এসে সমাজের বেদি থেকে উপদেশ দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিরাও এর সঙ্গে যুক্ত হন। কুচবিহার-বিবাহকালে ঢাকা সমাজ কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা করে এবং প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করে। এ-সময়ে বঙ্গচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে আসেন। পরে অবশ্য প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে। এ-সময়েই একটি সুন্দর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে 'শুভসাধিনী' নামে এক স্বল্পজীবী পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন (১৮৭০), কুলীনকন্যা উদ্ধার, বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সামাজিক কার্যের সঙ্গে সংযুক্ত 'পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ' এই সময়ে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ডা. প্রসন্নকুমার রায়, রজনীকান্ত ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, চণ্ডীকিশোর কুশারী, মনোরঞ্জন গুহ, শশিভূষণ বসু, কালীচন্দ্র ঘোষাল, নীলমণি চক্রবর্তী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, অমৃতলাল গুপ্ত, গুরুদাস চক্রবর্তী, মথুরানাথ গুহ প্রমুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের নানা সহযোগিতা পেয়ে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে। তাঁদের সাহচর্য ও তাঁদের বক্তৃতাগুলি ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। এ ছাড়া রেভারেন্ড জেমস হার্উড (বিলাতের ইউনিটেরিয়ান প্রতিনিধি) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এবং ওই সভারই প্রতিনিধি রেভারেন্ড ফ্লেচার উইলিয়ামস ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে (১৮৯৯) মূল্যবান বক্তৃতা দেন। প্রতাপচন্দ্র দাস তাঁর পিতার নামে রাজচন্দ্র ব্রাহ্মনিবাস প্রতিষ্ঠাদ্বারা, সরলা রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মিকা সম্মিলনী স্থাপিত হওয়ায় (১৮৮২-৮৩), নীতিশিক্ষা বিদ্যালয় ও ধর্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ের কার্যাবলীতে, এবং

সম্মিলন সমিতি প্রতিষ্ঠার কারণে (১৯০০ খ্রি.) পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানা সময়ে গতি সঞ্চারিত হয়।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শতবার্ষিক উৎসব পালিত হয় প্রায় দেড়বছর ব্যাপী এক পরিকল্পনা রূপায়ণের সাহায্যে। খ্রিস্টীয় ১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ অব্দ পর্যন্ত এই সমাজের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন (ভুবনমোহন সেনের পর) সতীশচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র রায়, মথুরানাথ গুহ, নেপালচন্দ্র রায়, গুরুপ্রসাদ মিত্র, অক্ষয়কুমার সেন, অমলচন্দ্র বসু, শিরীষচন্দ্র মজুমদার, যোগজীবন পান এবং সুরেশচন্দ্র গুপ্ত।[১]

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ

প্রধান শিক্ষকের চাকুরি নিয়ে ময়মনসিংহে আসার পর প্রধানত ভগবানচন্দ্র বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্রর পিতা) উদ্যোগে এবং কালীকুমার গাঙ্গুলী, ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস এবং গোবিন্দচন্দ্র গুহর সহযোগিতায় সেখানে যে-সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তা-ই পরে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ গঠনের মুখ্য কারণ হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এটি একটি স্থায়ী গৃহে আবাসিত হয়। কিছুকাল পরে এখানে এসে মূল্যবান বক্তৃতা দেন কেশবচন্দ্র সেন। ফলে সমাজের অন্তর্গত একটি 'আত্মোন্নতিসাধিনী সভা' স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় এখানে উপদেশ দিতে আসেন আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর আহ্বানে চারজন যুবক উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে হিন্দুসমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে থাকে। জানতে পেরে

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বঙ্কুবিহারী কর, পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত (১৯৫১)।

বিজয়কৃষ্ণ পুনশ্চ এসে সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন। ফলে শ্রীনাথ চন্দ, কৃষ্ণকুমার মিত্রর মতো যুবকরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আসক্ত হন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের আগমনে এ-সময়ে সমাজের কাজে গতি বৃদ্ধি হয়। পুরাতন মন্দির জীর্ণ হওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ নতুন করে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শেরপুরের জমিদার হরকুমার চৌধুরী এ-ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দান করে ব্রাহ্মসমাজকে আনুকূল্য দেন। কালীকুমার বসু, হরমোহন বসু (আনন্দমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), ললিতমোহন রায়, শরৎচন্দ্র রায়, দীননাথ চক্রবর্তী প্রমুখর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার ফলে সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মদের সপরিবারে বাসের জন্য 'ব্রাহ্মবাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'ভারতমিহির' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ ঘটে।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের সময় এই সমাজের দু-একজন সদস্য ছাড়া সকলেই কেশবচন্দ্রের কার্যের অননুমোদন করে তাঁকে পত্র লেখেন। ফলে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং প্রতিবাদীরা পৃথকভাবে উপাসনাদি আরম্ভ করেন।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত শরৎচন্দ্র রায় এবং অমরচন্দ্র দত্তর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের সুপরিচিত বিদ্যালয় ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউশনটি (বর্তমান আনন্দমোহন কলেজ) কলেজ স্তরে উন্নীত হলো। তার আগের বছর স্থাপিত হয়েছিল সমাজের স্থায়ী মন্দিরটি। সঙ্গত সভা, স্টুডেন্টস সার্ভিস, রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি সভা-সমিতি নিয়ে এ-সমাজের অগ্রগতি দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল।

ব রি শা ল ব্রা হ্ম স মা জ

ব্রাহ্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে বরিশালের বিশেষ অবদান ছিল। সুখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর এই শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এখানে ব্রাহ্মসমাজ

প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্যোগের সূচনা হয়। তিনি বরিশালের নিকটবর্তী লাখুটিয়ার উকিল রাজচন্দ্র রায়ের পুত্র রাখালচন্দ্র রায়ের মনে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের বীজ উপ্ত করে গিয়েছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন স্থিতি সত্ত্বেও। এমন সময় ব্রজসুন্দর মিত্রের আদর্শ-প্রভাবিত পাঁচজন যুবক ঢাকা থেকে বরিশালে এলেন। এঁরা ছিলেন নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বিদ্যাধর রায় এবং ললিতমোহন সেন। এঁরা ছাড়া অন্নদাচরণ বর্মাও ছিলেন প্রগতিবাদী যুবক। এই ছ-জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাখালচন্দ্র রায় পিতৃগৃহে যে-প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠানাদি শুরু করেন, তা থেকেই বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। কিন্তু পিতা জোর করে তাঁকে হিন্দুধর্মের পথেই টেনে আনেন।

এক অসহায় অবস্থায় যখন বাকি দু-জন যুবক কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছোটোভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বরিশাল আগমন ও তাঁদের সহায়তা যুবকদের মনে নবোদ্যম সৃষ্টি করল। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উপাসনাদি চলতে থাকল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে। তাঁরা কলিকাতা সমাজের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন।

এই সময়ে তাঁরা দুর্গামোহন দাসের সাহচর্য পেলেন। দুর্গামোহনের মন তখন একেশ্বরবাদ এবং থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনাসমূহে পূর্ণ। তাঁরও পরে অন্নদাচরণ খাস্তগীর, হরিশচন্দ্র মজুমদার, সর্বানন্দ দাসের সহযোগিতায় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উজ্জীবিত হয়। দুর্গামোহন সভাপতি হন এবং সর্বানন্দ দাস সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চণ্ডীচরণ মজুমদার প্রদত্ত জমির উপর এই সমাজের মন্দির নির্মিত হয়। এই সময়েই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বরিশালে এসে বক্তৃতা ও উপদেশের সাহায্যে সমাজে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। ফলে পূর্বোক্ত রাখালচন্দ্র রায় প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে তাঁর

সস্ত্রীক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর ছোটোভাই প্যারীলাল রায়ও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা পিতৃহীন হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় তাঁদের মা তাঁদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য মামলা করেন। এ-সময়ে দুর্গামোহন দাসের সহায়তা তাঁদের কাজে লাগে, তাঁরা মামলায় জয়লাভ করেন। অন্যদিকে নিজের বালবিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়ে দুর্গামোহন হিন্দুসমাজে 'ঘৃণিত' ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। নানা নিগ্রহ ও আন্দোলনের মধ্যে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ অগ্রগতি অব্যাহত রাখল। একে একে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত এবং যদুনাথ চক্রবর্তীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে এসে তাঁদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন। বিশেষ করে মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে নারীপ্রগতির এক নবতর আন্দোলনের সূচনা করলেন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের বিচ্ছেদের কালে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেই সমর্থন করে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মনোরমা মজুমদারকে প্রচারিকা নিযুক্ত করে এই সমাজ একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ইনি পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদি থেকে উপদেশ প্রদান করেন।

বাঘ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ

যশোহর জেলার একটি গ্রাম হলো বাঘ-আঁচড়া (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গ্রাম বলে এটি সমধিক পরিচিত। ১৮৬০-৬৩-এর মধ্যে এই গ্রামে ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হয়। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রমুখর উদ্যোগে এখানে প্রথমে একটি সঙ্গত সভা ধরনের সমিতি প্রতিষ্ঠিত

হয়। গ্রামের মল্লিকপরিবার এখানে সমাজ স্থাপনের ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য দান করতে থাকেন। কিন্তু এ-সময়ে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের কাজে বিজয়কৃষ্ণকে চলে আসতে হয় বলে এখানের সমাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। তবে 'নরপূজা-আন্দোলন' নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে কিছুকালের জন্য তিনি বাঘ-আঁচড়ায় ফিরে এলে এখানের সমাজ পুনশ্চ প্রাণবন্ত হয়। তাঁর স্ত্রী যোগমায়া তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কাজে তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের কুচবিহার-বিবাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাঘ-আঁচড়া থেকেই তাঁর প্রতিবাদ পাঠান। এরপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাঘ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ তারই শাখা সমাজে পরিণত হয়। এই বাঘ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ থেকে ব্রাহ্ম আচার্য হিসাবে শিক্ষিত হবার জন্য শশধর হালদারকে ম্যাঞ্চেস্টার বৃত্তিসহ অক্সফোর্ডে পাঠানো হয়।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ

কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরানগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত Struggle for Religious Independence and Progress in the Brahmo Samaj বক্তৃতা শুনে তিনি উপবীত ত্যাগ করে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন (১৮৬৫)। ফলে তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকী পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকেন এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সমাজের জন্য একটি মন্দির পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র সেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনে উপাসনা করেন। শ্রমিকদের জন্য প্রথম কল্যাণকর কর্মে ব্রতী শশীপদ 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র এসব কাজে তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি 'সাধারণ ধর্মসভা' এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'বিধবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজ অদ্যাপি বর্তমান।

এ ছাড়া অবিভক্ত বঙ্গে পরবর্তীকালে আরও নানা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এখনও নিমতা, বাণীবন, হরিনাভি প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ কার্যকর আছে। রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা, দুঃস্থ ভাণ্ডার, মহিলা শিক্ষালয়, মহিলা শিক্ষাশ্রম, সিটি কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডার প্রভৃতি কাজের সঙ্গে এখনও ব্রাহ্মসমাজগুলি নানাভাবে সংযুক্ত থেকে এর সমাজসেবামূলক কাজগুলি করে চলেছে। আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' এবং 'Indian Messenger'। এই সমাজের একটি চমৎকার গ্রন্থাগার আছে। শান্তিনিকেতনে নিয়মিত প্রার্থনা সভাদি এবং খ্রিস্টদিবসাদি পালিত হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির (কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট) তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এখান থেকে প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আজও পাঠকদের ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে। মাঘোৎসব মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

খাসি পাহাড়ের চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে ভাই নীলমণি চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৯) ব্রাহ্মসমাজ পাহাড়ি উপজাতিদের কল্যাণে নিয়োজিত হয়েও এককালে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

ব্রা হ্ম স মা জ স মূ হ
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্থাপিত

ভারতের সর্বত্রই ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন একদা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের ধাঁচে বহু স্থানেই প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব, ম্যাঙ্গালোর এবং ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনে প্রভৃতি স্থানেও প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কর্মসূত্রে লাহোর বসবাসকালে নবীনচন্দ্র রায় পাঞ্জাববাসী এবং পাঞ্জাবিদের একান্তজনে পরিণত হন। ব্রাহ্মসমাজের বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি পাঞ্জাবি অনুরাগীদের সহায়তায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁকে সহায়তা করেন লালা শোভারাম, লালা শ্রদ্ধারাম এবং লালা গণ্ডমাল এবং পণ্ডিত বসন্তরাম। এ ছাড়া বাঙালি রামচন্দ্র সিংহ ও হরচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ তাঁকে সমাজ গঠনে সাহায্য করেন। ফলে পাঞ্জাবিদের মধ্যে একটা নবচেতনার সূচনা হয়। অবশ্য সৎসভার প্রতিষ্ঠাতা লালা বিহারীলাল বিরোধিতা করতে থাকেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেখানে আমন্ত্রিত হন এবং তার অত্যল্পদিনের মধ্যে মুসৌরি যাবার পথে পঞ্জাব হয়ে যান। ফলে একটা জাগরণ দেখা দেয়। প্রকাশিত হয় ‘জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা’। পাঞ্জাবি ভাষায় ‘ব্রাহ্মধর্ম’ ও ‘আত্মতত্ত্ববিদ্যা’ নামে পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু এবং পরে আরও একাধিক বার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের লাহোর গমনে (১৮৭২ ও ১৮৭৪ এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে) সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। হিন্দিতে প্রকাশিত হয় ‘উপাসনা পদ্ধতি’ নামে পুস্তিকা। কিন্তু এই সময়ে পণ্ডিত

দয়ানন্দ সরস্বতীর আবির্ভাব ও আর্যসমাজের প্রগতি পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে কারণ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দয়ানন্দ লাহোরে এসে তাঁর ধর্ম প্রচার করে যান।

এরপর আসে কুচবিহার-বিবাহ প্রসঙ্গ। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের 'রক্ষণশীলতার' জন্য ওই সমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যোগ দেন এবং ব্রজলাল ঘোষের নেতৃত্বে একটি পৃথক সংস্থা স্থাপন করেন। ফলে সমাজে নববিধানী ও সাধারণী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বর্তমান থাকেন। যাই হোক, এরপরে অবিনাশচন্দ্র মজুমদার লাহোরে কর্মসূত্রে উপস্থিত হলে নানা জনকল্যাণমূলক কাজে সমাজ লিপ্ত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয়, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে একটি পবিত্রতা সংঘ এবং তার মুখপত্র 'The Purity Servant' প্রকাশ, দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণভাণ্ডার সাধন, দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজ সংঘটিত হতে থাকল।

এরপরে ভাই প্রকাশ দেব, লালা রঘুনাথ সহায়, পণ্ডিত গিরিধর রাই প্রভৃতির উদ্যোগে সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্ম প্রচারক' নামে একটি উর্দু পাক্ষিক পত্রিকার পুনঃপ্রচার হতে থাকে। রচিত হয় নানা ধর্ম বিষয়ক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র। রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি নতুন সমাজমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের সূচনা হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'পরমহংস সভা' প্রতিষ্ঠা দিয়ে। রক্ষণশীল সমাজের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসেই এই সংস্কারক সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে এগিয়ে এসেছিলেন দুই তড়খড়ভাই— দাদোবা পাণ্ডুরং এবং আত্মারাম পাণ্ডুরং। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন বালা মঙ্গেশকর ওয়াগলে, ভাস্কর হরি ভাগবত, নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ, বাসুদেব বাবাজি

নওরজি প্রমুখ ব্যক্তিগণ। 'পরমহংস সভা' ক্ষীণজীবী হয়ে উঠে গেলে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রার্থনাসমাজ'। এর মধ্যে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমদেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়ে কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাই আসেন। ফলে পরমহংস সভার পুরোনো সদস্যগণ পুনশ্চ জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং বাল্যবিবাহের প্রতিরোধকল্পে একত্রিত হয়ে বারংবার আলোচনা করতে লাগলেন এবং অবশেষে ৩১ মার্চ ১৮৬৭ তারিখে ডা. আত্মারাম পাণ্ডুরং-এর গৃহে 'প্রার্থনাসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এটি বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের অধীনস্থ হলো। পাঞ্জাব থেকে নবীনচন্দ্র রায় এসে তাঁদের উদ্যোগকে বহুগুনিত করে দিলেন। যুক্ত হলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আর. জি. ভাণ্ডারকর প্রমুখ মনীষীগণও। 'সুবোধ পত্রিকা' নামে এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা প্রকাশ করে এঁরা আপন একেশ্বরবাদী মত এবং সমাজসেবামূলক পরিকল্পনাদি প্রকাশ করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ তারিখে এই সমাজের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত রমাবাঈ-এর পরামর্শমতো নারীদের প্রতিষ্ঠানটি আর্যমহিলা সমাজ নামাঙ্কিত হয়ে বলিষ্ঠভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। একটি নৈশবিদ্যালয় (১৮৭৩), পূর্বোক্ত সুবোধ পত্রিকা (১৮৭৩) ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং মাঘোৎসব উদ্‌যাপন প্রভৃতি কর্মে উদ্‌বুদ্ধ এই সমাজ নীতিশিক্ষা এবং আত্মোন্নতির ওপর সবিশেষ জোর দিতে থাকে। এ বিষয়ে এস. পি. কেলকরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এজন্য পৃথকভাবে এর একটি 'সঙ্গত সভা' স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এই সমাজেই প্রখ্যাত বাগ্মী, দেশপ্রেমিক ও লেখক বিপিনচন্দ্র পাল এক বাঙালি ব্রাহ্মণ বিধবার সঙ্গে বিবাহিত হন।

শোলাপুর ও সন্নিকটস্থ অঞ্চলে ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে যে-ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার ত্রাণকার্যে প্রার্থনাসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে। পান্ধারপুর অনাথাশ্রম

স্থাপনও এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কাজ ছিল। এ ছাড়া ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে একটি অবৈতনিক গ্রন্থাগার স্থাপন (ভাণ্ডারকর ফ্রি লাইব্রেরি), একটি Liberal Religion-এর পঠনপাঠন (১৯০৪) এর সেবামূলক সংগঠন ছিল। সবচেয়ে বড়োকথা, অনুন্নত শ্রেণির সর্ববিধ উন্নয়নে এই সমাজ প্রথমাবধি সক্রিয় ছিল, এখনও আছে।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় আমেদাবাদ প্রার্থনাসমাজ ভোলানাথ সারাভাই, মহীপাত্রম রূপম, রণছোড়লাল ছোটোলাল, রায়বাহাদুর গোপালরাজ হরি দেশমুখ প্রমুখ সমাজহিতৈষীগণের উদ্যোগে। এর কোনো কোনো সদস্য বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্রাহ্মধর্মের অনুপ্রেরণা বিষয়ে পূর্বেই অবহিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পরের বৎসরই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সমাজ পরিদর্শন করেন। দু-বছরের মধ্যেই এর সদস্য সংখ্যা পৌঁছে যায় একশোয় এবং নারী-উন্নয়ন, প্রতিমাপূজা পরিহার ও অবতারবাদ পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রগামী হয়। একসময়ে তাঁরা দয়ানন্দ সরস্বতীকে তাঁদের বেদি ব্যবহার করতে দিলেও তাঁরা অচিরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং একেশ্বরবাদকেই আঁকড়ে ধরেন। ভোলানাথ সারাভাই-এর উদ্যোগে 'প্রার্থনামালা'র দুটি খণ্ড প্রকাশলাভ করায় এই নীতির প্রসারলাভ সহজ হয়। এ ছাড়া 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'স্ত্রীসুবোধ' প্রচারমালাও এ-কাজে সাহায্য করতে থাকে।

মহীপাত্রম রূপম অনাথ আশ্রম, মহীপাত্রম রূপম বিধবা আশ্রম, বালক বিদ্যালয়, দিওয়ালিবাঈ বালিকা বিদ্যালয় এবং অনুন্নত শ্রেণির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো সেবামূলক কাজ এই সমাজের অন্যতম কৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনে প্রার্থনাসমাজ, প্রধানত প্রথমে চিন্তামণি সখারাম চিটনিশ ও পরে রাওবাহাদুর সি. এস. চিটনিশের উদ্যোগ ও সহায়তায়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র পুনে ভ্রমণকালে একেশ্বরবাদের

যে-বীজ উপ্ত করে এসেছিলেন— তারই ফলশ্রুতি এই প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল পরে কর্মসূত্রে পুনে এসে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এই সমাজের কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সমাজের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করলেন।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত সি. এস. চিটনিশের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'সমাজসংস্কার সভা'। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মি. কুন্তে স্থাপন করলেন বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা। এ ছাড়া একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৮৪) ও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনেও এই সমাজ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ড. আর. জি. ভাণ্ডারকর ছিলেন এই সমাজেরও একজন বরণীয় সদস্য।

কেশবচন্দ্র সেনের মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতামালা যুবক ব্যবহারজীবী রাজা গোপালচার্লুর মনে ব্রাহ্মধর্মের বীজ উপ্ত করে এবং তিনি তাঁর নবলব্ধ অনুভব দিয়ে তরুণ বন্ধু সুব্বারায়ালুকে প্রভাবিত করলেন। ফলে মাদ্রাজে স্থাপিত হলো 'বেদসমাজ' (এপ্রিল ১৮৬৪)। দু-জনে মিলে প্রকাশ করলেন তামিল পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'। হিন্দুসমাজের সংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ করে প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেন। এখানে সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। সুব্বারায়ালুর মৃত্যু হলে তাঁর স্থান পূর্ণ করতে এলেন শ্রীধরলু নাইডু। কলকাতায় এসে তিনি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন (১৮৬৫)। কলকাতায় থেকে তিনি বাংলা শিখে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে দেশে ফিরে যান (১৮৬৫) এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বেদসমাজের সম্পাদক পদে বৃত হন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মাদ্রাজে গেলে বেদসমাজ পুনর্বার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ-সময়ে সমাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন কাশী বিশ্বনাথ মুদালিয়ার নামক একজন প্রভাবশালী নাগরিক। প্রতিমাপূজা নিন্দা করে,

স্ত্রীশিক্ষার ও বিধবাবিবাহের প্রসারকল্পে তিনি 'ব্রহ্মসাধিকা' বলে একটি নাটক রচনা করেন এবং 'ব্রহ্মদীপিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৭২ সালের 'তিন আইন' পাস হবার আগে এর সমর্থনে এই সমাজ এগিয়ে এসেছিল।

কিছুকাল পরে এই সমাজের দায়িত্ব পান বুচিয়া পান্টালু। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর সপক্ষতা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী সে-সময়ে মাদ্রাজ সমাজ পরিদর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা গজপতি রাও প্রভৃতির দানে ও বুচিয়া পান্টালুর উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই সমাজ স্থায়ী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর রাওবাহাদুর কে. বীরিসালিঙ্গম, পান্টালু, রাওবাহাদুর আর. ভেঙ্কটরত্নম নাইডু প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সংযোগে বেদসমাজ নানা সেবামূলক কার্যে যুক্ত হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনুন্নত শ্রেণির উন্নয়ন প্রভৃতির কাজে বেদসমাজ মাদ্রাজে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এবারে আমরা যথাসংক্ষেপে অন্যান্য সমাজের আদিযুগের বিবরণ প্রদান করছি। সমুদ্রতীরবর্তী ও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ম্যাঙ্গালোরে জাতিভেদপ্রথা চূড়ান্ত ছিল। এর বিরোধিতার জন্যই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায় ও অমৃতলাল বসুকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের বাসুদেব বাবাজি নওরজিও। এইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি 'উপাসনা সভা'। এর দু-বছরের মধ্যেই (১৮৭২) লক্ষ করা গেল এমনকী সারস্বত ব্রাহ্মণদেরও প্রায় পঁচিশজন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি আরও সমাজ, যেমন বিল্লাভর সমাজ, প্রতিষ্ঠিত হলেও উপাসনা সভাটিই পরে ম্যাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়।

কলকাতা সমাজে ট্রেনিং নিয়ে এসে এর কিছু যুবক উপাসকসমাজটিকে প্রাণবন্ত করে গেলেন। এ-সমস্ত কাজেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল রঘুনাথাইয়ারই সবচেয়ে বেশি। এই সমাজ থেকেই রঙ্গরাও-এর উদ্যোগে অনুন্নত শ্রেণিদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৯৮)।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'পেটা সমাজ' নামে যে-সমাজটি বাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটিই পরে বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। তামিল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা থেকে ব্রাহ্মভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও. এস. রাজাবাবু নাইডু এটি প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন এবং প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই ইচ্ছা রূপায়ণ করতে এগিয়ে আসেন সেখানকার কিছু সৈন্যও। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চন্দ্রশেখর আয়ার এই সমাজের প্রথম আচার্য হন। পরে এঁদের উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হলে সমাজের কাজ এখান থেকেই পরিচালিত হতে আরম্ভ করে। শিক্ষা, ধর্ম সম্পর্কে বইপত্র ও পত্রিকা প্রকাশে তাঁরা উদ্যোগী হন।

তামিল রাজ্যসমূহের মধ্যে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজমহেন্দ্রীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন রাওবাহাদুর কে. বীরসালিঙ্গম। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মসুলিপত্তমে। কে এটি প্রতিষ্ঠা করেন সঠিক জানা যায় না। তবে ভি. দামোদরাইয়া এর সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া এ-সময়েই বাপাৎলাতেও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তিনটি সমাজে যথাক্রমে ব্রাহ্মকর্মপদ্ধতি, ব্রাহ্মচিন্তা ও ব্রাহ্ম-আবেগ লক্ষ করা গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বীরসালিঙ্গমের জীবনই ছিল ব্রাহ্মকর্মধারার জীবন্ত উদাহরণ। অন্ধ্রপ্রদেশে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করেন (১৮৮৭), বিধবাবিবাহ আন্দোলন বেগবান করেন (১৮৮১) এবং বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গদেশের বাইরে আসামের নওগাঁতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়া ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি এবং ধুবড়িতেও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হয় উৎকল সমাজ থেকে (১৮৬৯)। পরবর্তীকালে মধুসূদন রাও, বিশ্বনাথ করের মতো ব্যক্তিত্ব এই সমাজকে উন্নত করে। বস্তুত এই সমাজ কলকাতার তিনটি সমাজের সঙ্গে যেন আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। দেওঘর, হাজারিবাগ, গিরিডি, রাঁচি প্রভৃতি সাঁওতাল পরগনার নানা স্থানে এ-সময়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওঘর সমাজের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু এবং রাঁচি সমাজের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিহারের ভাগলপুর (বাঙালি অধ্যুষিত শহর), মুঙ্গের, বাঁকিপুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে নানা সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজেই কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথম 'নরপূজার আন্দোলন' সংঘটিত হয়। বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, পাঞ্জাবের লাহোর সমাজ ছাড়া (পূর্বে আলোচিত) মুলতানেও একটি ব্রাহ্মসমাজ হয়েছিল। সিন্ধুপ্রদেশে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) একাধিক ব্রাহ্মসমাজ সুগঠিত হয়। ইন্দোরেও এক সময়ে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। কলকাতার বাইরে চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। নোয়াখালিতে ১৮৭২ এবং কুমিল্লায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত যথাক্রমে কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও ব্রজসুন্দর মিত্রের উদ্যোগে। পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখর জন্মস্থান শ্রীহট্টে

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত দেওয়ান রায়বাহাদুর কালিকাদাস দত্তর প্রচেষ্টায়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি, সৈয়দপুর এবং শিলিগুড়িতে প্রধানত চণ্ডীচরণ সেন প্রমুখর চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এইরকম শান্তিপুর ও খুলনা, হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী আমরাগারি, মেদিনীপুরের কাঁথি, বীরভূমের নলহাটি, রামপুরহাট, শান্তিনিকেতনে কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের শান্তিনিকেতনস্থ মন্দিরটি অদ্যাপি বর্তমান।

আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of Brahmo Samaj* অনুসরণে কয়েকটি সারণি ও তালিকার সাহায্যে বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজসমূহের স্থান, স্থাপনা, সংখ্যা, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রাহ্মদের সংখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করছি:

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের তালিকা

আদি (কলিকাতা) ব্রাহ্মসমাজ ১৮৩০

কৃষ্ণনগর ১৮৪৪

ঢাকা ১৮৪৬

কুমারখালি ১৮৪৮

চট্টগ্রাম ১৮৫০

ভবানীপুব-১ ১৮৫২

ময়মনসিংহ, বেহালা ১৮৫৩

কুমিল্লা ১৮৫৪

বলুহাটি, বর্ধমান, ফরিদপুর ১৮৫৭

বোগরা ১৮৫৮

বোয়ালিয়া ১৮৫৯

চন্দননগর-১, গৌরনগর ১৮৬০

বরিশাল ১৮৬১

শ্রীরামপুর ১৮৬২
ভাগলপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কোন্নগর, রংপুর, সুলতানগাছা, শ্রীহট্ট ১৮৬৩
বাঘ-আঁচড়া, বহরমপুর, চুচুড়া, হাওড়া, শান্তিপুর ১৮৬৪
বরাহনগর, শাপুর ১৮৬৫
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা, কিশোরগঞ্জ ১৮৬৬
বারুইপুর, হাজারিবাগ, কালীগাছা, পাবনা, শালিদা ১৮৬৭
কালনা ১৮৬৮
হরিনাভি, রাঁচি ১৮৬৯
কাছাড়, দিনাজপুর, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কাকিনা ১৮৭০
মালপাড়া, ওসমানপুর, সিরাজগাছা ১৮৭০
আকনা ১৮৭১
চন্দননগর-২, নোয়াখালি ১৮৭২
কুচবিহার, মুদিয়ালি, মুর্শিদাবাদ ১৮৭৩
ভবানীপুর-২, পাচুমলা, রামপুরহাট ১৮৭৪
গৌরীফা ১৮৭৫
ঝিনাইদহ, মুন্সীগঞ্জ ১৮৭৬

বাংলাদেশে মোট এই ৬১টি ব্রাহ্মসমাজ

বি হা র

মুঙ্গের ১৮৬৬
গয়া ১৮৬৭
জামালপুর ১৮৬৭
পাটনা (বাঁকিপুর) ১৮৬৬

উ ড়ি ষ্যা

বালাসোর ১৮৬৫
কটক-১ ১৮৬৫
কটক-২ (উৎকল ব্রাহ্মসমাজ) ১৮৬৯

আ সা ম

গোয়ালপাড়া ১৮৭০
গৌহাটি ১৮৭০
নওগাঁ ১৮৭০
শিলং ১৮৭৫
শিবসাগর ১৮৬৬
তেজপুর ১৮৭০

উ ত্ত র - প শ্চি ম প্র দে শ স মূ হ

এলাহাবাদ ১৮৬৪
এলাহাবাদ (উত্তর ভারত ব্রাহ্মসমাজ) ১৮৬৭
আগ্রা (পুনঃস্থাপন) ১৮৭৬
বেরিলি ১৮৬৫
দেরাদুন ১৮৬৭
গাজিপুর ১৮৭২
গোয়ালিয়র ১৮৭২
কানপুর ১৮৬৫

ম ধ্য ভা র ত

জব্বলপুর ১৮৬৫
লক্ষ্ণৌ ১৮৬৭

সি ন্ধু প্র দে শ

হায়দ্রাবাদ ১৮৬৯
করাচি ১৮৬৯

দ ক্ষি ণ ভা র ত

মাদ্রাজ (বেদসমাজ) ১৮৬৪
মাদ্রাজ (দক্ষিণ ভারত ব্রাহ্মসমাজ) ১৮৭১

বাঙ্গালোর-১ ১৮৬৭
বাঙ্গালোর-২ ১৮৭০
বাঙ্গালোর-৩ ১৮৭১
ভাবনগব ১৮৭৬
ম্যাঙ্গালোর ১৮৭০
সালেম ১৮৬৭

পা ঞ্জা ব

লাহোর ১৮৬৩
মতিহারি ১৮৭৫
মুলতান ১৮৭৫
রাওয়ালপিণ্ডি ১৮৬৭

প শ্চি ম ভা র ত

বোম্বাই (মুম্বাই) ১৮৬৭
আমেদাবাদ ১৮৭১
কৈরা ১৮৭৬
কোলাপুর ১৮৭৫
পান্ধারপুর ১৮৭৪
পুনে ১৮৭০
রাজকোট ১৮৭৩
রত্নগিরি ১৮৬৯
সাতারা ১৮৭৪
সুরাট ১৮৭৫

বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ মিলিয়ে মোট ১০৮টি ব্রাহ্মসমাজ

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩৩। বাংলায় ৬১-টি সমাজ বেড়ে হয় ১২৪-টিতে। এ ছাড়া ছোটোনাগপুর ও বর্মাতে (বর্তমানে মায়ানমার) যথাক্রমে তিনটি করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১১

খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুসারে এ-সংখ্যা কমে গিয়ে ২৩৩ থেকে ১৮২-তে নেমে আসে, যদিও লন্ডনে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এরপর থেকে সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হতে থাকে এবং বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় অঙ্গুলিপর্বগণ্য। কোনো কোনো সমাজ কোনো প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

অথচ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রাহ্মদের সংখ্যা ভারতবর্ষে যখন ৪,০৫০, তখন দশ বছর পরে ১৯১১-তে এ-সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৫০৪। এর কারণ প্রধানত পরিবারে সংখ্যা বৃদ্ধি। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা খুব বেড়েছিল বলে মনে করার কারণ নেই। অবশ্য এই দশ বছরে মুসলমান ও হিন্দুর বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৮ ও ৬.৭ তখন ব্রাহ্মদের সংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩৫.৯।

বর্তমানে এই সংখ্যা ও হার যথেষ্ট কম। সম্ভবত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা বিষয়ে সাধারণের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা দিয়েছে। তবুও ব্রাহ্মসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন সিটি কলেজসমূহ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম গ্রন্থালয়) এবং ব্রাহ্মসাহিত্য আজ পর্যন্ত সাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে। ব্রাহ্মদের সৃষ্ট নানা রচনা এখনও আকরগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে নতুন করে আত্মজীবনীর শাখাটি ব্রাহ্মমনীষীদের দ্বারাই উদ্‌বুদ্ধ হয়। এ ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু রচনা, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখর রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলিই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে বিশ্বজয়ী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

উপসংহার

ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক উন্নতি কতখানি ঘটিয়েছিল সে-বিষয়ে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। তবে খ্রিস্টীয় প্রচারকে অবদমিত করে স্বদেশি ভাব প্রচারে এর অবদান স্মরণযোগ্য। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে আধুনিককালে যে দেশপ্রেমগত এবং বৌদ্ধিক জাগরণ ঘটে— ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা তাতে ছিল অন্যতম। শিক্ষাবিস্তার, নারীজাগরণ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, জাতিভেদপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি সামাজিক কাজে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন, এখনও করে চলেছেন। এখনও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা শতবর্ষ পার হয়ে অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের মনোভাবকে এই সমাজে প্রচার করে চলেছে। এখনও তিনটি সমাজে ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব পালিত হয়ে একেশ্বরবাদের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে চলেছে।

কিন্তু এসব কাজকর্ম যদি ভবিষ্যৎ বিস্মৃতও হয়, ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনটি সমাজ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকাদি ভারতের ইতিহাস রচনার দলিল বিশেষ। খুব কম পরিমাণেই এগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। ব্রহ্মসংগীত আধুনিক ভদ্রসমাজের সংগীতরূপে চিহ্নিত। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের আত্মজীবনী ও জীবনচরিতগুলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ ছাড়া সর্ববিধ ভাষাতেই সাহিত্যের নানা শাখার চর্চা উল্লেখনীয় পরিমাণে ঘটেছিল। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত মহা ধর্ম সম্মেলনে ব্রাহ্মসমাজের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকে

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এর যে বিশ্বজনীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন তা ভারতীয় ধর্মেরই সারকথা ছিল। ব্রাহ্মধর্ম ভারতীয় ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ধর্ম নয়। যুগের প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব ঘটেছিল।

পরিশিষ্ট ক

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যখন লিখেছিলাম তারপর এর পাঠকবৃন্দ আমাকে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য হওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে সংযোগ করতে বলেন, এঁদের মধ্যে একজন বন্ধুবর সুবাস মৈত্র। সে-কারণে 'পরিশিষ্ট ক' অংশে সেটি সংক্ষেপে নিবেদিত হলো। প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদভুক্ত হয়েছিলেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং সম্ভবত এই পদ প্রত্যাহার করে নেননি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে একটা বিশেষ বির্তক দেখা দেয়। একসময়ে মহর্ষি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় মানসিক এবং আর্থিক আনুকূল্য দান করেছিলেন। হয়তো সেইসূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল— তিনি নিজে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। বহুবার তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে বক্তৃতাও দিয়েছেন। এই সমাজের অনেক তরুণ সদস্য রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। এরা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভায় একটি প্রস্তাব রাখেন— রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করা হোক। প্রস্তাবটি ৫১-২৯ ভোটে গৃহীত হলেও নানা কারণে এ-কাজে বিলম্ব হতে থাকে। এর মধ্যে একটা বড়ো কারণ হলো সমাজভুক্ত কিছু সদস্য রবীন্দ্রনাথকে 'যথেষ্ট পরিমাণে' ব্রাহ্ম মনে করতেন না। পরের বছরের বার্ষিক কার্যনির্বাহক সভায় প্রস্তাবটি পেশ করা হয়; কিন্তু একটিমাত্র ভোটের ব্যবধানের কারণে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখা হয়। জটিলতা বাড়তে থাকে।

অসম্মানের দোহাই দিয়ে সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্রসহ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়সহ নয়জন কার্যনির্বাহক সভার সদস্য পদত্যাগ করেন।

এ-সময়ে সুকুমার রায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ পুনশ্চ কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' নামে ৫২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন ১৫ মার্চ ১৯২১ সালে। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাপান-আমেরিকা থেকে ফিরে এলে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সভাপতিত্বেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন রামমোহন লাইব্রেরিতে। আমরা প্রশান্তচন্দ্রের পুস্তিকা থেকে প্রয়োজনীয় কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে দিই:

> . . . রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্ব্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়তাকে বর্জ্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্ব্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র— বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
>
> ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্ব্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী।
>
> রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও

> ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার সুমহান আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের জীবনে, তাঁহার নানা বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই।. . .

এ-দিকে সম্মানিত সদস্য করার পক্ষে মতান্তর চলতেই থাকে। নানা টালবাহানার পর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ স্থগিত সভাটির অধিবেশন আহূত হয়। এই সভার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকা (১৬ চৈত্র ১৩২৭) জানায় যে '. . . অধিকাংশের মতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯৬ ও বিপক্ষে ২৩৩ জন ভোট প্রদান করিয়াছিলেন।' এই সম্মানে রবীন্দ্রনাথ বেশি সম্মানিত হয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্মানিত হয়েছিলেন— বলাই যায়। একটা কথা এখানে স্পষ্ট করা যেতে পারে, সমস্ত তরুণ সদস্যই রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছিলেন— এ-কথা বলা উচিত হবে না। পরম রবীন্দ্রভক্ত সতীশচন্দ্র রায় পর্যন্ত বিরোধিতা করে তত্ত্বকৌমুদীতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যদিও পরে তিনি এটিকে তাঁর জীবনের 'অবাঞ্ছিত ঘটনা' বলে ঘোষণা করেছিলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এ-সময়ে চরম রবীন্দ্রবিরোধিতা করেছিলেন। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

পরিশিষ্ট খ

শ্রমজীবী

শি ব না থ শা স্ত্রী

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই!
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী-নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।

২

ঘোর রোল ভারতে উঠিল।
অগ্রসর অগ্রসর
এই রব ঘোরতর
শুনে কর্ণ বধির হইল;
উঠিতেছে যে যেখানে ছিল।

৩

ওই দেখ চলেছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্ব্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায় পায় ধনীরাও চলে,
ছোট বড় ধায় কুতূহলে।

৪

জাগিবার বাকি কেবা আর
যাহারা অবলা বলে
বিখ্যাত ধরাতলে,
সেই নারী উঠিছে এবাব,
মহানন্দে হয় আগুসার।

৫

নব দৃশ্য ভারতে উদয়!
নব রাজ সমাগমে,
নব শক্তি নবোদ্যমে,
পূর্ণ আজি সবারি হৃদয়
আজ দেশ যেন অগ্নিময়।

৬

হেনকালে কে ঘুমাতে পারে!
অকর্ম্মণ্য জড় যারা
ঘুমায় ঘুমাক্ তারা।
থাকে থাক্ অজ্ঞান আঁধারে
শ্রমজীবী! ডাকিরে তোমারে।

৭

সমাজের মূল তোরা ভাই!
কে দেখেছে ধরাতলে,
মূল বিনা তরু চলে
মাথা চলে তাতে লাভ নাই
যেথা ছিল রহিবে তথাই।

৮

ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত,
কেমন সংগ্রাম রত।
এই ব্রত— রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবাবে।

৯

আয় তবে শ্রমজীবীগণ
নবোৎসাহে চলে আয়,
সময় বহিয়ে যায়,
ঘোরতর বাজিয়াছে রণ
যা করিবে সার্থক জীবন।

নির্ঘণ্ট